মগের মুলুক

মগের মুলুক

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
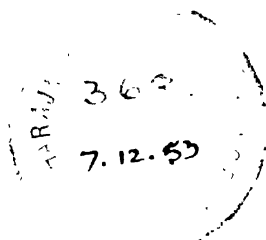
নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ, ১৩৫৮

তিন টাকা

প্রকাশক—জে, এন, সিংহ রায়, নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড,
২২, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১
মুদ্রণ—রণজিৎকুমার দত্ত, নবশক্তি প্রেস, ১২৩, লোয়ার সার্কুলার
রোড, কলিকাতা-১৪

সূচীপত্র

এই গল্পগুলির রচনাকাল ১৩৫৫—৫৭

মগের মুলুক

মগের মুল্লুক

ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। ধূ-ধূ করছে ধান খেত।

টঙের ঘরে জানলার ধারে বসে আছে পঞ্চমা। ফাঁপানো খোঁপায় ফুল গোঁজা! গলায় রূপোর শিকলি, হাতে খাড়ু। কচি গোলপাতা দিয়ে বাঁধা বিড়ি টানছে বসে-বসে। সরু-সরু ভাসা-ভাসা চোখে চেয়ে আছে খেতের দিকে।

কেউ যেন আসবে, অথচ আসছে না!

জ্যোৎস্নায় কেমন ভেজা-ভেজা দেখাচ্ছে খেতগুলো। তেমনি ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা নধর-নরম ভাব তার শরীরে। কুড়ি বছর হতে পঞ্চমার এখনো দু-তিন বছর বাকি।

জানলার বাইরে কার পায়ের খসখস। শিস দিচ্ছে কে মিঠি-মিঠি।

কই, পাড়ার কুকুরগুলো সমস্বরে খেঁকিয়ে উঠছে না তো? তবে নিশ্চয়ই কোনো চেনা লোক। পাড়ারই কোনো পয়মন্তঃ ছোকরা।

পাশের ঘরে কান খাড়া করে বসে আছে চাজা। আর তার দ্বিতীয় পক্ষের বউ মঞ্চিন মগ্নী।

'সিঁড়ি দিয়ে উঠল টঙে?' স্ত্রীকে জিগ্গেস করলে চাজা।

'উঠছে। পা টিপে-টিপে উঠছে।' প্রায় দম বন্ধ করে বললে মঞ্চিন।

সুঁদরির খুঁটির উপরে টং। মাটি থেকে খাড়া এক মানুষের সমান উঁচু। টঙের নিচে তাঁত। টঙের নিচেই ঢেঁকি।

পাড় দেওয়া ঢেঁকি নয়। ঘানির মতন হাতে ঘোরানো।

টঙের মেঝেয় সুঁদরি কাঠের পাটাতন। যেখানটায় কাঠে কুলোয়নি সেখানটায় শুপুরি গাছের চেরা। আগন্তুকের জুতোর শব্দ জেগে উঠল পাটাতনে।

পঞ্চমার ঘরের দরজা খোলা। সটান ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল আগন্তুক। মিঠি-মিঠি শিস দিতে লাগল।

চিনতে পেরেছে পঞ্চমা। মোচা মগের ছেলে লাফরা মগ। তেইশ-চব্বিশ বছরের জোয়ান ছোকরা। দেখতে-শুনতে দিব্যি।

শুধু দেখতে-শুনতে? অবস্থা কি প্রকাণ্ড মোচা মগের! প্রায় পঞ্চাশ কানি জমি। অগুনতি মোষ। পাড়ার মাতব্বর মোচা। তার নামেই পাড়ার নাম। মোচা পাড়া।

লাফরার পরনে লুঙ্গি নয়— লুংসি। মোটা বুনটের হলে লুঙ্গি বলে। চিকণ বুনটের হলে বলে লুংসি। লাফরা

বড়লোক। অন্তত বড়লোকের ছেলে। তার উপরে বড় ছেলে, প্রথম সন্তান। মগী আইনে যাকে বলে ওরাসা। বাপমায়ের এক জন কেউ মরলেই যে সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ আদায় করে নিতে পারবে। পরে হবে আরো এক চৌথের হকদার। আর, যাকে বিয়ে করলেই আধাআধি সরিক হবে পঞ্চমা।

গা তুলবে না কি পঞ্চমা? মুচকে হেসে দাঁড়াবে না কি কাছে গিয়ে? দেবে না কি একটা চুমু খেতে?

যেন অতিকষ্টে ঘাড় ফেরাল পঞ্চমা। চোখ দুটো তেরছা করল। শক্ত করে বাঁকালো ঠোঁট দুটো।

'ও কি, চলে গেল না কি? দরজা বন্ধ করল না?' চাজা ঝাঁজিয়ে উঠল।

'তাই তো। ফিরে যাবার শব্দ হচ্ছে সিঁড়িতে।' মঞ্চিন হতাশের মতন বললে। 'আহা, মুখে আর শিস নেই—'

কি সর্বনাশ! এমন পাত্র ফিরিয়ে দিল পঞ্চমা? ধনে-মানে এমন যে তাক-লাগানো ছেলে। এমন যে হাতবাড়িয়ে-লুফে-নেবার মতন! দরজায় খিল লাগাতে যেখানে এক পলকও দ্বিধা করার কথা নয়। তাকে, পুরো একটা নিশ্বাস ফেলবার আগেই, হাতের হাওয়ায় তাড়িয়ে দিলে! মেয়েটা কি পাগল হয়ে গেছে?

'নষ্ট হয়ে গেছে।' মদের ভাঁড়ে চুমুক দিল মঞ্চিন।

'হারামজাদি।' দাঁত কিড়মিড় করে শক্ত একটা গাল দিলে চাজা। এত মিঠা মদ, তেতো হয় উঠল।

আবার কেউ এসেছে বুঝি। হ্যাঁ, শিস দিচ্ছে। কুকুর যখন ঘেয়োচ্ছে না, তখন এ পাড়ারই কেউ বাসিন্দে। চেনা লোক।

মুখ বাড়িয়ে দেখ তো একবার চেয়ে।

মদে থলথল করছে মঞ্চিন। খোলা দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল, থানডান।

মন্দ কি। একটু বয়স হয়েছে, এই যা। তা বেটা-ছেলের আবার বয়স কি!

কি, ঢুকেছে ঘরের মধ্যে?

ঢুকেছে।

মনের মিল হল না বলে বউর সঙ্গে ছাড়াবিড়া হয়ে গেছে থানডানের। কাজিয়া-কোন্দল কিছু হয়নি। বলেছে বউকে, তোর মনের মানুষের কাছে তুই যা। আমি আমার মনের মানুষ খুঁজে নিই। দলিল হয়নি, আদালত হয়নি, শুধু মনে-মনেই বোঝাপড়া। আর, সেইটেই সমাজের কাছে আইনের কাছে সরল প্রমাণ। সুস্থ ব্যবস্থা। মন মানে তো থাক, না মানে তো পথ ছ্যাখ। রোচে-পোচে তো খা, না রোচে তো যা।

যেমন কটাক্ষে বিয়ে তেমনি কটাক্ষে তালাক।

নতুন বউ খুঁজতে বেরিয়েছে থানডান। পঞ্চমাকে পছন্দ হয়েছে।

কিন্তু পঞ্চমা ?

'দেখ তো দরজায় খিল পড়ল কি না—' মঞ্চিনের গায়ে ঠেলা মারল চাজা।

'কে জানে! যখন দেরি হচ্ছে তখন খিল পড়েছে বোধ হয়।' মঞ্চিনের সাধ্য নেই উঠে দাঁড়ায়। জড়িয়ে-জড়িয়ে বললে, 'কিন্তু অমন ছোকরা ছেড়ে দিয়ে শেষে এই আধ-বয়সীকে ধরবে ?'

কিছুই বলা যায় না। মনের মামলা এলোমেলো। কিসে ডিক্রি কিসে ডিসমিস কে বলবে!

ওস্তাদ বাজিয়ে, সুর-বাঁধা বীণা কোলের উপর বসানো, তবু গান জমে না। বৃষ্টি পড়ে ঠাণ্ডা হয়েছে দশ দিক, ফিট-ফাট নরম বিছানা, তবু ঘুম কই!

'থানডানও বুঝি চলে গেল।' মঞ্চিন ঢুলতে-ঢুলতে বললে।

'চলে গেল ? খিল পড়ল না ?' লাফিয়ে উঠল চাজা। 'আর পাত্র কই এ অঞ্চলে ?'

জানলা খুলে বসে থাক সারা রাত।

যদি কেউ না-ই আসে শেষ পর্যন্ত। দোরে যদি খিল না চাপায় পঞ্চমা!

চাপাবেই না তো! কুড়ি বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যেই কুড়িতে পা দেবে অমনি পাখা গজিয়ে পালিয়ে যাবে এক দিকে।

মঞ্চিন আর বসে থাকতে পারছে না। গা ছেড়ে যাচ্ছে।

যাচ্ছে কাদা পাকিয়ে। বললে, 'আমি আর বসতে পাচ্ছি না। আর মদ নেই।'

পাটাতনের উপরেই শুয়ে পড়ল মঞ্চিন।

কিন্তু চাজাকে ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না। টোপ ফেলেছে সে, ফাতনার দিকে চেয়ে তাকে পাড়ে বসে থাকতে হবে।

কিন্তু কই, শিস কই ? হাততালি কই ? পাটাতনের উপর জুতোর মসমস কই ? শব্দ কই দরজায় খিল দেবার ?

বোশেখী পূর্ণিমার রাতটা বৃথাই যাবে নাকি ?

কান ভোঁ-ভোঁ করছে চাজার। শিস শুনতে পাবে না। হাততালিও নয়। হয়তো খালি পায়েই উঠে আসবে। আসুক। আসতে দাও। দরজায় যদি খিল পড়েই, ভাবনা কি, ভোরে উঠে মত দেবে চাজা।

তাকাল একবার বাইরের দিকে। ঝিম-ঝিম করছে জ্যোৎস্না।

ঢুলতে-ঢুলতে কখন ঘুমিয়ে পড়ল কাৎ হয়ে।

হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল কুকুরের দল। বেপাড়ার কেউ এসে পড়েছে বোধ হয়। ধড়মড় করে উঠে বসল চাজা।

'কে রে ? কে রে ?' ছেনির জন্যে হাত বাড়াল।

রাত তখন অনেক। চাঁদ জানলার কাছে চলে এসেছে। একটু উঁকি মেরে দেখল, পঞ্চমা তখনো জেগে। তেমনি জানলার কাছে ব'সে।

দরজায় খিল পড়েনি। বুদ্ধের ছবির কাছে জ্বলছে একটি নতুন মোম।

কিন্তু কুকুরের ডাক থেমে গেল কেন? যদি চেঁচালি তবে থামলি কেন? খেতে পেল না কি কিছু?

পা টিপে-টিপে টং থেকে নেমে এল চাজা। শুনতে পেল চাপা গলার ফিসফিসানি। জানলার নিচে দাঁড়িয়ে কে কথা কইছে পঞ্চমার সঙ্গে।

'হ্যাঁ, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।' ঝাপসা গলায় বলছে পঞ্চমা : 'উঠে এস চুপি-চুপি। কুকুরগুলোকে খেতে দিয়েছি আফিং-মাখানো মিষ্টি। কিছু ভয় নেই। লগ্ন এখনো কাবার হয়নি আমার বিয়ের। একের পর এক মোম জ্বালিয়ে রাখছি আমি। আমার সঙ্গে-সঙ্গে ঠাকুরও জেগে আছেন—'

বুদ্ধদেবকে ঠাকুর বলে মগেরা। বলে, "ফারাতারা"।

তবু কি দ্বিধা করছে রূপা!

'চলে এস সটান, দরজা খোলা আছে। তুমি ঘরে এসে ঢুকলেই দরজায় খিল দেব। দরজায় একবার খিল চাপাতে পারলেই পাকা হয়ে গেল বিয়ে।'

একটি মাত্র মুহূর্ত। ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢোকা আর দরজায় খিল লাগানো। তার পরে ঘর আর ঘর নয়, অন্ধকার নয় আর অন্ধকার।

'কিন্তু যদি এমন-তেমন কিছু হয়?'

কী হবে! বাবার ইচ্ছেয় আমি স্বয়ম্বরে বসেছি। আমার বয়েস যদি কুড়ি হত আমি পথে-ঘাটে হাটে-মাঠে বেরিয়ে আমার বর ধরে আনতে পারতাম। কুড়িতে এখনো পা দিইনি বলে আমার এই দুর্দশা। বাবার মত লাগবে। কিন্তু কুড়ি না হলেও একেবারে কুঁড়িটি নই আর। সেয়ান-শক্ত হয়েছি। তাই আমারো একটা মত আছে। আমিও রাজী-বেরাজী হতে পারি। তাই ঠিক হয়েছে স্বয়ম্বর হবে। কুড়ি বছরের কম বয়সের মেয়েদের যেমন হয়ে থাকে সমাজে। যেখানে গাইয়ে-বাছুরে ভাব থাকে সেখানে বনে গিয়েও দুধ দেয়। কিন্তু এখানে বাপে-ঝিয়ে অবনিবনা। তাই, সবটা যেমন মেয়ের হাতে নেই তেমনি বাপের হাতেও নেই। ঠিক হয়েছে, সদরে বসে বাপ প্রথমে বাছাই করে দেবে, আর মেয়ে— এখানে একটু হাসল পঞ্চমা— মেয়ে করবে ছাঁটাই। কিন্তু যদি মনের মতন লোক একবার পায় এই চৌকাঠের এপারে, অমনি ক্ষিপ্র হাতে খিল এঁটে দেবে সজোরে। একবার খিল দিতে পারলেই অখিলের রানি হয়ে গেল পঞ্চমা। দরজায় কপাট পড়ল বটে, কিন্তু মনের কপাট খুলে গেল।

আর কোনো উপায় নেই?

হাতে-হাতে কিছু নেই। এক উপায় তোমার সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া।

'তাই চলো না।' জানলার কাছে আরো বুঝি একটু

এগিয়ে এল রূপা। বললে, 'খালের ঘাটে নৌকো বাঁধা আছে। জোয়ার এসেছে মাঝ রাতে।'

কিন্তু লাভ নেই। এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া— কোথায় যাবে তুমি মুলুক ছেড়ে? বাবা আবার ঠিক ধরে নিয়ে আসবে।

'তবু, এইবার নিয়ে তিনবার পালানো হবে। আরেক বার— চার বার পালানো হলেই—'

জানে তা পঞ্চমা। কুড়ি বছরের মেয়ে স্বাধীন ইচ্ছায় যাকে খুশি বিয়ে করতে পারে—একসঙ্গে বসে এক থালায় ভাত খেলেই বিয়ে সিদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু কুড়ির নিচে হলেই যত ফ্যাচাং। বাপের মত লাগবে। তবে মেয়ে যদি কুড়ির নিচে অথচ ষোলোর উপরে হয় আর পর-পর চার বার বাপের আশ্রয় থেকে পালিয়ে যেতে পারে কারু সঙ্গে, তবে তারই সঙ্গে পাকা হয়ে যায় তার বিয়ে। এক জনকে অবলম্বন করে এত নিদারুণ যার অধ্যবসায় তাকে চার বারের শেষে সমাজ আর শাসন করতে চায় না। বিয়েটা মেনে নেয়।

কিন্তু ও-পথে বড় নটখটি। কতটুকুই বা তোমার মুলুক, কতটুকুই বা মহল্লা। এ-পাড়া নয় ও-পাড়া, এ-বন্দর নয় তো ও-বন্দর। কোথায়, কত দূর বা তুমি যাবে! সুদূর আরাকানে তো আর যেতে পারবে না। আর, এ অঞ্চলের বাইরে কোথাও তোমার আড্ডা-আস্তানা নেই। সুতরাং লোক-জানাজানি হয়ে যাবে। বাবা কান ধরে মেয়েকে

বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। সে যেমন লজ্জা, তেমনি কেলেঙ্কার।

'তবু তিন বার হবে। তারপর আরেক বার— আরেক ফাঁকে— কোনো রকমে দু'জনে কোথাও একটু গা-ঢাকা দিতে পারলেই— ব্যস্, তখন আর আমাদের পায় কে!'

কিন্তু চার বার তো চূড়ান্ত হবে না এক্ষুনি। এ রূপোর রাত, এ সোনার সুযোগ কি নষ্ট করে দেবে? এক্ষুনি-এক্ষুনি যা হয়, তা কি কেউ ফেলে রাখে? দু' পা হেঁটে ঘরে এলে যেখানে ষোলো আনা হয় সেখানে বারো আনা পাবার জন্যে কে বিশ পা হেঁটে ঘাটে যায়?

'কিন্তু তোমার বাবা তো পথ আটকাবে। ঘরে ঢুকতে দেবে না।'

'ঘুমিয়ে পড়েছে বাবা। এখন রাত কত খেয়াল করো? চলে এস গুটি-গুটি।'

আমি এগিয়ে যাচ্ছি দরজার দিকে। চৌকাঠ পেরুবে আর অমনি, নিশ্বাস পড়তে না-পড়তে, দরজা বন্ধ করে দেব। সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধ হয়ে যাবে সকল কুচ্ছাকচাল।

গলির মুখে টঙের সিঁড়ির দিকে এগুলো রূপা। যা এক্ষুনি-এক্ষুনি হয় তার জন্যে কে বসে থাকে? ঘরেই যাকে পাওয়া যায় তার জন্যে কে নদীতে ভাসে?

আরেক পা এগিয়েছে, কাঁধের কাছে ছেনির কোপ পড়ল।

মাতালের গলায় খলখল করে হেসে উঠল চাজা। ঝিমন্ত কুকুরগুলো খেঁকিয়ে উঠল।

টলে পড়ে গেল না রূপা। মার খেয়ে সোজা পালিয়ে গেল মাঠ ভেঙে।

শূন্য ঘরে দরজায় খিল দিল পঞ্চমা। বিয়ের লগ্ন কাবার করে দিল। ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল মোমবাতি।

আর, চাজা ভাবতে লাগল, এক কোপ বসিয়েই ক্ষান্ত হল কেন ? মদের নেশায় গা-হাত-পা টলছে, জুৎ মত বসাতে পারেনি কোপটা। এখনো অনেকগুলি কোপ বাকি থেকে গেছে। নিসপিস করছে হাত। মদের নেশার মতো পেয়েছে এবার রক্তের নেশা।

ঐ পালিয়ে যাচ্ছে রূপা ? হ্যাঁ, ওকে আর পাওয়া যাবে না নাগালের মধ্যে। তবে— কাকে, কাকে ঘা বসাবে ? কোথায়, কে আছে তার দুষমন ?

হঠাৎ কলিমদ্দি সাহেবের মুখটা মনে পড়ল।

হাতের মুঠ শিথিল হয়ে এল আস্তে আস্তে। মনে পড়ল দরজার কাছে দেয়ালে টাঙানো জুতোর পাটিটা। বেত আর হাণ্টার। নেপথ্যে হয়তো বা বন্দুক।

দরকার নেই মারামারির স্বপ্ন দেখে। ঘাসে ঘসে ছেনির গায়ের রক্ত মুছে ফেলল চাজা।

দুই

কলিমদ্দি খাসমহল অফিসর।

দরজা দিয়ে তার আপিসে ঢুকেই রাজা-রানির ছবি চোখে পড়বে না। চোখে পড়বে একপাটি জুতো। দেয়ালে পেরেক ঠুকে তার মাথায় ঝুলিয়ে রেখেছে।

'আরেক পাটি কই ?' জিগ্‌গেস করেছিল কে একজন বন্ধুস্থানীয় আগন্তুক।

জুতোটার আকার-প্রকার দেখেছ ? ক' ইঞ্চি লম্বা মনে হয় ? এ জুতো কি পরবার জন্যে ?

তবে ?

একটু বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝতে হয়। প্রহার করবার জন্যে। মার না দিলে খাজনা আদায় হবে কি করে ?

বেত-বিছুটি দিয়ে মারা যায়। জুতোর চেয়ে কম জোরালো নয়। তবু জুতোয় যেমন কাজ হয় তেমনটি আর কিছুতেই হয় না। আর সব হাতিয়ারে শুধু মারই থাকে,

জুতোয় থাকে তার চেয়ে আর একটু বেশি। জুতোয় মাখা থাকে অপমান।

মারের সঙ্গে অপমান মানে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।

একটা সামান্য চাপরাশি আর চৌকিদার চাজাকে ধরে নিয়ে এল কাছারিতে।

চৌকিদার কোমরে দড়ি বাঁধতে চেয়েছিল। চাপরাশিই ধমকে উঠল, কেন, ও তো ফৌজদারি করেনি, দড়ি-কড়া দেবে কেন? তেরিমেরি করে তখন দেখা যাবে।

না, চাজা তেমন অবাধ্য-দুরন্ত নয়। কাছারিতে তলব হয়েছে, সে যাবে ঠিক পিছু-পিছু। খাজনা দেয়নি, সেটা আবার এমন কি অপরাধ!

অপরাধ যাই হোক, শাস্তি আছে প্রশস্ত।

খাজনা কই? হুমকে উঠল খাসমহলের হাকিম।

খাজনা কিসের? মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল চাজার। ঠিক রাগ করে বলছে না, যেন অবাক হয়ে বলছে।

সত্যিই তো, অবাক হবারই তো কথা! কোন কাণা সমুদ্র পেরিয়ে দূর আরাকান থেকে এসেছে তারা দল বেঁধে। জঙ্গল উঠিত করে আবাদ ফলাবার জন্যে। আর, একেকটা চরে কী নির্ফাক জঙ্গল, ঝোপের আড়ালে বাঘের নড়া-চড়া, সাপের কিলিবিলি। হাতে সেই ছেনি, যাকে দেখে জঙ্গল পথ করে দেবার জন্যে সরে-সরে যাচ্ছে আশে-পাশে।

জঙ্গল কাটতে-কাটতে টঙ বানিয়েছে গাছের ডালে। ’বাঘের ভয়ে গাছের উপরেই তাদের বাস-ঘর। জঙ্গল একটু সাফ-সুতরো হয়ে যেই জমি বেরিয়েছে, অমনি দেশী কামারের থেকে লাঙল কিনে এনেছে। বনের থেকেই ধরে নিয়েছে মোষ। মাটিতে ফাল ঢুকিয়েছে। দীর্ণ রেখায় রস এসেছে মাটির। এসেছে কাজল-কালো ধান।

একেকটা কালি জঙ্গল এমনি করে আবাদী ধানের মাঠ হয়ে উঠেছে। শুধু সাহসে আর পরিশ্রমে। রক্তের বিনিময়ে। কেউ গিয়েছে বাঘের পেটে, কেউ কুমীরের। কাউকে সাপে কেটেছে। কেউ বা মরেছে ম্যালেরিয়ায়। তবু দমেনি তারা। জঙ্গলকে পরাভূত করেছে। জঙ্গলের গ্রাস থেকে উদ্ধার করেছে মাটিকে। শুধু উদ্ধারই করেনি, ফলবতী করেছে।

এত ঘাম আর রক্ত দিলাম, তার আবার খাজনা কি!

বা, বেশ কথা! মাটিকে মাঠ বানালি, কিন্তু সেই মাটি কি তোর? তোর বাপুতি সম্পত্তি? মাটি যদি তোর না হয়, তবে মাঠও তোর নয়। পরিশ্রম করে জঙ্গল উঠিত করেছিস, তার বাবদ খাজনা মকুব পেয়েছিস দু’-সন। এখন আস্তে-আস্তে খাজনা বসছে, সইয়ে-সইয়ে। যেমন তোর জমির মোট, তেমনি তোর খাজনার নিরিখ। নামমাত্র খাজনা। জমির একুন বেশি বলে খাজনাটা মোটা দেখায়। তাও এক

লাফে' চাপছে না, ধাপে-ধাপে উঠে আসছে। নইলে, তোরা ভেবেছিস যার যা খুশি দু'-তিনখানা মাঠ নিয়ে বসে পড়বি আর এন্তার ফসল তুলবি— কেউ কিছু বলতে পাবে না!

তা ছাড়া আবার কি!

শোন, যদিও তোরা মগেরা এসে এখানে বসেছিস আস্তানা গেড়ে, এটা মগের মুলুক নয়, এটা কোম্পানীর এলেকা। লুটপাট করে জমি খাবি, এ জঙ্গীবাজি সরকার বরদাস্ত করতে পারবে না। তাই একটা বিধি-ব্যবস্থা, বিলি-ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম দু'-সন লাখেরাজ— শেষে— ক্রমে-ক্রমে—

খুব খোলসা করে বোঝেনি কিছু চাজা। জঙ্গল কেটে চাষ করে মাটির মুখের চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছে বলেই না এই জুলুমদারি। বেশ, তবে আচষা মাটি আগাছা গজিয়ে ফের জঙ্গলে ফিরে যাক।

তার আর উপায় নেই। তুমি ফেলে রাখো, তোমার জমি খাস হয়ে অন্যত্র বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। এসব খাস-মহলের খামখেয়ালি। আর, জমি জঙ্গলে ফিরে গেলেও, তুমি আর ফিরে যেতে পারো না—

তুমি বাসা বেঁধেছ। সংসার করেছ। ফিরে যে যাবে, খাবে কি? জমি কই?

আর যেখানেই যাও না কেন, কোথাও আর সেই মগের মুলুক নেই।

সুতরাং—

খাজনার ব্যবস্থা করো। খোরাকির জন্যে ধান রেখে বাড়তি ধান বেচে খাজনা জোগাও।

অত হিসাব-কিতাব করতে পারব না। হাতে যখন টাকা হবে তখন দেব। বাস্তব্য যখন করছি তখন আর পালিয়ে যাচ্ছি না।

কিন্তু টাকা এসে হাতে লাগে কই? থাকে কই? যেই ধান ওঠে খলেনে, নানান দিক থেকে বিদেশী বেপারীর নৌকো এসে জোটে। নানা রকম মনিহারি জিনিসের দোকান খোলে। যা পারে নেয় ফেরাই করে।

বিদেশী বেপারী লাগবে কেন? আছে দেশী জুয়োর আড্ডা। 'কো' খেলা। কিংবা 'ফেকজাতি'। এক রকম তাসের হাত-সাফাই। তাতেই সব খুইয়ে আসে। তার উপর আছে আবার মদ— খাঁটি হ'লে চলবে না, চাই বিলিতি মাল। আর যদি সমস্ত কাজের বার হয়ে যেতে চাও, আফিং ধরো, চোখ দু'টোকে সূক্ষ্ম একটা রেখায় নিয়ে গিয়ে বুঁদ হয়ে বসে থাকো।

খাজনা কই? হুমকে ওঠে খাসমহলের হাকিম।

হাত একেবারে খালি— দু'হাত চিৎ করে অসহায়ের মত হাসল চাজা।

কিন্তু তাই বলে পিঠ খালি যাবার তো কোনো অর্থ

নেই। খাজনা-আদায়ী জুতোর এক ঘা বসিয়ে দিলে পিঠের উপর। আরো এক ঘা। ভাগ্যিস ডেলা পাকিয়ে আফিং খেয়ে এসেছিল। তাই আবার নির্লিপ্তের মত হাসতে পারল চাজা।

জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখার চেয়ে মার অনেক ভাল। মারের একটা শেষ আছে, কিন্তু জলে একবার ডোবালে কখন যে ফের পার পাবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

ঘটি-বাটি, তাঁত-ঘানি ক্রোক করে কী পাওয়া যাবে! জমি ধরো। জমি ধরবার আগে আরেকবার নিয়ে এসো কাছারিতে। জুতোর ডগার দিক ছেড়ে এবার গোড়ালির দিক দিয়ে চেষ্টা করো। পিঠে না মেরে গালে মারলে কেমন হয়?

মগ ছাড়া মগের জমি ধরা যায় না। যদি একটু মন-জানাজানি থাকে তবে একে অন্যের জমি ধরবে না বলে এক-কাট্টা হওয়া যায়। কিন্তু আইনের ঘরে ষড় করে আইনকে ফাঁকি দিচ্ছে মকিমালি। আগে বাড়ি-ঘরের নিশান ছিল না, এখন অনেক টাকার মালগুজারি করে। পাশের গাঁয়ের জোরদার জোতদার। মনের সাধ, মগের মুলুকের জমি কিছু হাতিয়ে নেয়। তাই আগেই হাত করেছে খাসমহলের কেরানিকে। ভূয়ো ফেরেবী এক মগ খাড়া করে নীলেমী জমি কিনে নিয়েছে। দিয়েছে হয়তো তাকে এক দলা

আফিং কিংবা দু' বোতল বিলিতি জল— তাতেই নাম ভাড়া দিয়েছে স্বচ্ছন্দে। নাম চলছে হয়তো নাথু মগ, ধান উঠছে মকিমালির খলেনে। এমনি আছে আরো একজন ফেরেব-বাজ। হরিশ্চন্দ্র কাউর। মগেরা গোপনে তাদের বর্গাদার হয়ে থাক এই তাদের মতলোব। শুধু দেখাক মাঠের উপরে তারা, আর খাটের উপর হরিশ্চন্দ্র আর মকিমালি।

এমনি করে জমি একবার বেরিয়ে গেছে হাতের থেকে, আবার চাজা তা নিয়ে এসেছে কবজায়। আগের পরিবার তার বুঝদার ছিল। নৌকো বাইত মাছ ধরত লাকড়ি ফাড়ত তাঁত বুনত। নিজে খেটে খাটাত চাজাকে। ভুঁই রুইত পর্যন্ত। জমি যখন পাতলা হয়ে আসত, বন্ধ করে দিত আফিং, কমিয়ে দিত মদের মাত্রা, জুয়ার আড্ডায় না পাঠিয়ে পাঠিয়ে দিত— ঠাকুরবাড়ি— ঠাকুরবাড়ি মানে "ফারাতারার" ঘরে। সৎ পথে থাকলেই "বুদ্ধু মানু" দয়া করে, হাতে পয়সা হয়। হাতে পয়সা হলে জমি হতে কতক্ষণ। আর জমি যদি পাই তবে রাজত্বের আর বাকি কি!

এমনি করে তেরো-চৌদ্দ বছর গেছে একে-একে। অনেক হাকিম বদল হল কিন্তু খাজনা-আদায়ী জুতোর বদল নেই। নাল বসিয়ে তলা মজবুত করা হয়েছে, এখানে-ওখানে পড়েছে ক'টা তালির প্রহসন। চলেছে সেই পিটুনির রেওয়াজ। আফিং-মদের বিনিময়ে বেনামীতে জমি ফুসলানো।

এক জনই শুধু নেই। চাজার পরিবার, পঞ্চমার মা। খাটনির তুলনায় খাওয়া না পেয়ে হলদে রোগে ধরল। হলদে থেকে শাদা হয়ে গেল আস্তে-আস্তে।

প্রথম-প্রথম অতটা কষ্ট হয়নি চাজার। মরল বলেই তারাও-মগের তালাকী পরিবারকে, মঞ্চিনকে, নিকে করতে পেল। তারাও-মগের জেনানাকে দেখে যে না বলতে পারে সে মরদ জন্মায়নি মগের এলেকায়।

'তারাও তোমাকে তাড়াল কেন?'

'একটু রং-ঢং বেশি তো আমার। তাই সন্দেহ করলে মিছিমিছি—'

যাকে সন্দেহ করা যায় অথচ প্রমাণ পাওয়া যায় না—চাজার মনে হল তার মধ্যে নতুন রকমের স্বাদ। তার সঙ্গে বসে মদ খাওয়ায় নতুন রকম আনন্দ! নতুন রকম আলস্য!

এবার যখন চাজাকে বাকি-বকেয়ার তাগাদায় কাছারিতে ধরে নিয়ে এল, তখন, আশ্চর্য, সে কাঁদলে। মনে-মনে কাঁদলে। কাঁদলে পঞ্চমার মা'র জন্যে। পিঠে যখন জুতো পড়ল, মনে হল বুকের উপর মারলে। মনে হল, জমি নিলেম হয়ে যাবার পর আবার নতুন জমি ধরবার আর তার শক্তি নেই।

পঞ্চমার মা মরেছে, কিন্তু পঞ্চমা আছে। পঞ্চমা ফিরিয়ে দিতে পারে অবস্থা। কিছু খাটা-খাটনি করতে হবে না তার,

শুধু একটি শাঁসালো দেখে বর বাছতে হবে। এমন বর যার ধানের মরাইয়ে হাত ঢোকাতে পারে সহজে। সম্পত্তিতে ভাগ নিতে পারে আট আনা।

যদি বাকি এ আধকানি জমিটাও যায় তা হলে চাভ্রাকে গাবুর খাটতে হবে। পরের জমিতে কিরষানি। খাই-খোরাকিতে হালিয়া।

আর বউ?

বউ নয় তো নাই-দিনের কুটুম। মদ জুটবে না তো মনও উঠবে না। যে লবণ-ভাত খেয়ে গেছে সেই ছিল বউ—পঞ্চমার মা। পঞ্চমা তার মেয়ে হয়ে কেন এমন দিকদারি করছে! কেন বুঝছে না বাপের অবস্থা!

ও পঞ্চমা মুখ তুলে চা, বেপারীর পসরা তোর ঘাটের দরজায়। বুঝে নে তোর জায়-জিনিস।

পঞ্চমার চোখ বাজে সওদার দিকে।

তিন

তালতলির ভাঙা হাটে দু'জনের দেখা— পঞ্চমার আর রূপার।

খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক করে পঞ্চমা বললে, 'পালাব।'

'পালাবে?' রূপার ভাসা-ভাসা চোখ উলসে উঠল: "তা হলে এই নিয়ে হবে তিন বার।'

বাইশতলির ঘাটে দু'জনে দু' রাস্তা দিয়ে এসে হাজির হল। চোখের পলকে কথা, চোখের পলকে মন-জানাজানি। কথার পিঠে কথা লাগে না, না লাগে সল্লা-পরামর্শ— একটু মাত্র চোখের চাউনিতেই মুক্ত আকাশের সংবাদ।

'যদি এবার ধরা পড়ি?' ভয়ে-ভয়ে বলল পঞ্চমা।

'তা হলে কোপ এবার পিঠে না পড়ে ঘাড়ে পড়বে।' হাসল রূপা: 'তবু তিনবার তো হবে! আর একবার হলেই তুই আমার বউ। আমার ঘরে-ওঠা পাকা ঘুঁটি—'

কেমন ভয়-ভয় করছে পঞ্চমার। কেবলই মনে হচ্ছে, ধরা পড়ে যাবে!

বা, ধরা তো পড়বই। ধরা তো পড়তেই হবে। ধরা না পড়লে লোকে বুঝবে কি করে যে, দু'জনে পালিয়েছিলাম একসঙ্গে। ধরা পড়াই তো আমাদের জিৎ। আমাদের টেক্কা।

তবে বেশি দূর না ঘুরে পাশের ঘাটে গিয়েই ধরা দিই। ডাকাডাকি করে লোক জানাই। জড়ো করি হাট-ঘাটের মানুষদের। বলবে, কে যায় রে নৌকোয়? চাজা মগের মেয়ে পঞ্চমা আর ফাওনা মগের ছেলে রূপা নয়? আবার কে! পালিয়ে যাচ্ছে বুঝি সমাজের চোখে ধূলো দিয়ে? কেলেঙ্কারির কারসাজিতে? ধর ধর দুটোকে। হাসতে-হাসতে ধরা দেব আমরা। আমাদের অন্তরে কূট-কপট নেই। চিরকালের জন্যে ধরা পড়তে চাই বলেই ধরা দিতে চাই।

তোমার আজ দিক ভুল হয়ে যাচ্ছে, পঞ্চমা। এক রাত্রি একসঙ্গে বাস না করলে পালানো হয় কি করে? দু'জনে নৌকোয় করে একসঙ্গে একলা একটু বেড়ালুম, তাকে কি আর পালানো বলে? তাকে বলে হাওয়া-খাওয়া। এক রাত্রি ঘর আর পাড়া থেকে একসঙ্গে গরহাজির থাকতে পারলেই পালানোটা সিদ্ধ হল— ভুলে গেলে তুমি? একসঙ্গে এক রাত্রি— আর তা পাড়ার বাইরে। পাড়ার বাইরে

মানেই গাঁয়ের বাইরে। মগেদের এক পাড়াতেই এক গাঁ। মগেদের গাঁ নেই— পাড়া। এক চাপে এক বসতি— খালের পাড়ে। আর যা খাল তাই নদী, এপার ওপার দেখা যায় না— আর বাকিটা ধান খেত, ঢালা ধান খেত। আর উই দূরে আরেক বসতি— আরেক পাড়া।

প্রথম দু'বারের কথা মনে আছে বৈ কি পঞ্চমার। দু'-দুবারই পাড়ার বাইরে রাত কাটিয়েছিল তারা। প্রথম বারটা তো কাটিয়েছিল এক অঘোর জঙ্গলে। কোথা দিয়ে যে কোথায় চলে এসেছিল কিছুই খেয়াল করতে পারেনি। অসম্ভব শীত ছিল সেবার। কাঠ-পাতা জড়ো করে আগুন করেছিল রাতভোর। শুধু শীতের ভয়ে নয়, বাঘের ভয়েও। সর্বক্ষণ ভয় থাকলে কি ভালো লাগে ? এ তো আগুনে বন পোড়ানো নয়, মন পোড়ানো। একবার মুখ ফুটে বলেছিল পঞ্চমা, আর কত আগুন পোয়াবো ? ঘুম পায় না বুঝি ?

'বেশ তো, ঘুমোও না। আমি জেগে পাহারা দেব সারা রাত।' চোখে একটু হাসির ঝিলিক দিয়েছিল রূপা : 'বাঘকে ভয় হ'তে পারে, কিন্তু আমাকে তো তোমার ভয় নেই।'

'ঠাণ্ডা মাটিতে বুঝি শোয়া যায় ?'

ফাঁপানো খোঁপায় একটু হাত বুলিয়ে দিয়েছিল রূপা : 'তোকে বুকে জড়িয়ে রাত কাটাবার দিন এখনো আসে নি। ধৈর্য ধরো, স্মরণ করো 'বুদ্ধ মানু'কে। ভেবে দেখ, আমাদের

কত বড় পরীক্ষা। এমনিতে যদি বাপের মত থাকত, কিংবা যদি তুমি কুড়ি-বছরের হতে, তা হলে তো জল-ভাত ছিল। কিন্তু আমাদের তো বিয়ে নয়, আমাদের ভালবাসা। আমাদের আরো কঠিন নিয়ম। আগুনের কাছে আরো সরে এস। ভয় কি, আগুনই আমাদের রক্ষে করবে।'

দ্বিতীয় বার ছিল অঘোর বৃষ্টি। থমথমে কালো রাত, বৃষ্টি হচ্ছে ঝমঝম করে। সেদিন নৌকো ছিল এক গাছের এক কোশ, এবারের মত ছইতোলা ডিঙি নৌকো নয়। সাধ্য ছিল না জলের থেকে আত্মরক্ষা করে। ফাঁড়ির মুখে শর-বনের মধ্যে নৌকোটা ঢুকিয়ে রেখেছিল সারা রাত। ভিজে একশা হয়ে গিয়েছিল। দাঁতে দাঁত লাগিয়ে কেঁপেছিল হি-হি করে। তবু মনে-মনে তারিফ করেছিল বৃষ্টিকে। বৃষ্টিই বাঁচিয়ে দিয়েছে তাদের।

যতই এগুচ্ছে ততই কঠিন হচ্ছে পরীক্ষা। তাই এবারে, তিন বারের বার, ফিনফিনে জ্যোৎস্না উঠেছে। আর, নৌকোও জুটেছে কোশ নয়, দস্তরমত টপ্পর-দেওয়া ডিঙি নৌকো। শান্ত নদীব উপর দিয়ে হেলে-দুলে বেয়ে চলেছে।

নিশুতি রাত জ্যোৎস্নায় খাঁ-খাঁ করছে। শুধু নদীর কল-কল। কোথায় ঝুরঝুরে মাটি ভেঙে পড়ার আওয়াজ।

আজ রাতে তাদের কিসের ভয়? বাঘের, না, ঝড়ের? না, উদ্যত ছেনির?

না, এই জলের উপরকার স্তব্ধতার ?

'তোমার পিঠের ঘা কেমন আছে ?'

'সেরে গেছে। বেশি বসাতে পারেনি। নেশার হাতে জোর কই ?'

'শহরের হাসপাতালে গিয়েছিলে ?'

'কি হবে হাসপাতালে গিয়ে ? ওখানে গেলেই পুলিশের খপ্পরে পড়ব। পুলিশ আর পিঠের ঘা শুকোতে দেবে না—'

এমনি যত আজে-বাজে কথা।

হঠাৎ হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল পঞ্চমা। বললে, 'মুলুক-ছাড়া এমন জায়গা নেই যেখানে তুজনে চলে যেতে পারি এক জোয়ারে ? এ নদী কি টানা পথে চলে না, না, কেবলই এঁকে-বেঁকে ঘুরে-ঘুরে মগ-পাড়াতেই ফিরে আসে ?'

মগ-পাড়াতেই ফিরে আসে। মগের মুলুক ছাড়া আর কোথায় বাস্তব্য করবে ? কলকাতায় কি থাকতে পারি আমরা ? না, আর কোনো শহরে ? যাই আমাদের আইন-কানুন হোক, যাই আমাদের বিধি-ব্যাপার, আমাদের মুলুক আমাদেরই রাজত্ব। হয় এ-পাড়া নয় ও-পাড়া। যেমন মনের মানুষ চাই তেমনি আবার চাই দলের মানুষ।

'কত রাত হল এখন ?' চোখ বুজে আরেকটা হাই তুলল পঞ্চমা।

'মাঝ রাত।' ঝোপঝাড় দেখে পাড়ে নৌকো লাগাল

রূপা। বললে, 'ঘুম পাচ্ছে? হাল ছেড়ে দাও এবার। ঘুমোও।'

'ঘুম পাচ্ছে না।' পঞ্চমার কথা অভিমানে ভরা।

'তবে বাইব আরো নৌকো?'

'না।'

'তবে?'

'এবার ধরা দেব—'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল রূপা। বললে, 'না। এখনো আরো এক কিস্তি বাকি আছে। যা নিয়ম তাই মানতে হবে। নিয়ম না মানলে শাস্তি নেই। সকলের চেয়ে দামী হচ্ছে শাস্তি—'

কবে সেই শেষ কিস্তি আসবে কে জানে? নিয়মের না আছে মাথা, না আছে মুণ্ডু। পরের রাত কবে আসবে তাই ভেবে আজকের এই রাত উড়িয়ে দিতে হবে? না দিলে কি হয়? কে জানতে আসছে?

'বুদ্ধু মানু' সব জানছেন। সব দেখছেন। হিসাব রাখছেন।

'ঘুম যদি না পায়, তবে নাও বিড়ি খাও।' পিরানের পকেট থেকে রূপা গোলপাতার বিড়ি আর দেশলাই বের করে দিল। বললে, 'ফারাতারার দয়ায় রাত দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

দেখতে দেখতে কাটল না। দু'-দুটো ছিপ নৌকো ছিপ-ছিপ করে দাঁড় ফেলে দু'দিক থেকে ঘিরে ফেলল তাদের।

একটা শোরা সর্দারের ছিপ, আরেকটা চাজার। সঙ্গে কতগুলো মর্দ-মাতব্বর।

'এবার আমি মেয়েটাকেই কেটে ফেলব।' হামলে উঠল চাজা। 'চিঁড়ে করবার জন্যে নয়া ধান কিনতে হাটে পাঠিয়েছিলাম— সেই ফাঁকে—'

ছেনি সঙ্গে আনতে দেয়নি শোরা। মাঝে পড়ে নিরস্ত করলে চাজাকে। বললে, 'উঃ, মারবি কেন? পালানোটা ভেস্তে দিলি, তাইতেই তো কাজ হল।'

পরে রূপাকে শাসন করলে। 'এত হন্যে হওয়া কেন? আর দেড়-দুই বছর অপেক্ষা করতে পারিস না?'

মাথা হেঁট করল রূপা। যেন ওদের কাছে নয়, নিজের কাছে পরাজয়ে। সত্যি, এত সংযম দেখাতে পারে সে, আর এটুকু পারে না? ঘন হয়ে কাছে বসে স্থির থাকতে পারে, আর ফারাক হয়ে দূরে বসে স্থির থাকতে পারে না? সান্নিধ্যে শান্তি আর অদর্শনে উৎকণ্ঠা?

আর, দেড় কি দু'বছর! এইটুকু সময় একটু ধৈর্য ধরে থাকতে পারলেই তো সর্বসিদ্ধি। সত্যিই তো! এত সয়, আর এটুকু সইবে না?

ওদের সঙ্গে-সঙ্গে সময়কেও তার শত্রু মনে হয়। মনে হয়, যত শিগগির পৌঁছুনো যায় মন্দিরে। পঞ্চমার কথা মনে হলে সময়ের আর দিশপাশ থাকে না। মনে হয়, আর কাউকে

নয়, এই সময়কেই জয় করি। এই সময়কে জয় করবার জন্যেই ফারাতারা বেরিয়েছিল ঘর ছেড়ে।

বাইশতলির মোড়ে এসে পথ ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

ডাকবাংলা ঘুরে যে রাস্তা সেই পথ ধরলে চাজা। পঞ্চমার বাঁ-হাত মুঠ ক'রে চেপে ধরা ডান হাতে।

'ছেনি সঙ্গে নিতে দেয়নি শোরা সর্দার। কিন্তু বাড়িতে আছে। কাটা-কোটা সব এই ছেনিতে। এই ছেনি দিয়েই আজ কাটব তোকে বাড়িতে গিয়ে। আজ মদ খাওয়া নেই যে, হাত পিছলে যাবে। কেটে পুঁতে রাখব তোকে মাটির তলায়। কুমিরের মুখে ধরে দিয়ে আসব নদীতে।'

পঞ্চমার মুখে রা-শব্দ নেই। কোন সনের কোন তারিখে তার জন্ম, বাপের শোনা কথায় তারই হিসেব করে মনে-মনে। মা নেই যে মনের দুঃখটা বুঝবে। জন্মের তারিখটা ঠেলে পেছিয়ে দেবে এক কথায়।

'তোকে নিয়ে আমার প্রচণ্ড কলঙ্ক! জাত-জ্ঞাতের মজলিশে মুখ দেখানো অসম্ভব। তোকে আমি আর বাড়িতে তুলবো না, দেব না খেতে-পরতে। তাই বলে ওই শুয়োর-মুখোটার সঙ্গে বেরিয়ে যেতে দেব ভাবছিস? কখনো না। তোকে আমি কেটে কুচি-কুচি করে ফেলব। যে মেয়ে সংসারের সুসারে আসে না, তাকে দিয়ে কী কাজ?'

কতদূর যেতেই মারফৎ সেখের সঙ্গে দেখা। মারফৎ সেখ ডাকবাংলার চৌকিদার।

কিন্তু অমন গোঁজ হয়ে বসে আছে কেন গাছতলায়?

'কি মিয়া, বইয়া আছে ক্যান?'

মুসলমানদের বাঙালি বলে মগেরা। এই বাঙালিদের প্রতিবেশিতায় বাস করে-করেই কিছু-কিছু শিখেছে ভাঙ্গা বাংলা।

মুখ তুলে তাকাল মারফৎ। চাঁদের বাসরে এ সে দেখছে কি চোখের কাছে? এ যে হুরকুমারী।

'কাঁদিছে না কি? এত রাতে বাইরে আসিছে ক্যান? কী অইছে?'

চৌকিদার সংক্ষেপে বললে তার বিবরণ। তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছে। তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ঘর থেকে।

এই মাঝরাতে? কেমন খটকা লাগল চাজার। অপরাধ?

অপরাধ সাংঘাতিক। জেলার লালমুখো বড় কর্তা এসেছে। উঠেছে ডাকবাংলায়। দুপুরে শিকার করেছে পাখি-পাখাল, এখন মাঝ রাতে তার অন্য রকম শিকার চাই। সন্ধে হতেই লাল জল খাচ্ছে বোতলে-বোতলে। এখন একেবারে লেলিয়ে উঠেছে। বলছে, যদি না আনতে পারিস গুলি করব।

এখানে এ সব মিলবে কোথা? যারা এখানে এ-মর্মে আসে তারা নিয়ে আসে খুশিমত। এখানে যা দু'-একটা আছে ইধার-উধার তারা আঘাটের মড়া। এমনিতে গুলি করে মারবে, আর ও এনে সামনে ধরলে মারবে কুপিয়ে-কুপিয়ে।

'কয় কি, মগনি চাই। আমি এত বড় করিয়া জিব্‌ভা কাডি। তোবা করি। কই, মগেগো মধ্যে এমুন বেচাল নাই। হ্যা গো মাতারিরা যদি এদিক-সেদিক কাণ্ডও কিছু করে, সমাজের বাইর অইয়া যায় না, বিয়া পায়। তাও নিজেগো মধ্যে কাণ্ড— এমুন অচরিত কাণ্ড নয়—'

কে শোনে কার কথা! বলে বারো জঙ্গল তেরো ভুঁই খুঁজে আনো। নইলে খুলি উড়িয়ে দেব। যাও, রাত বারোটা পর্যন্ত তামাদি।

'আমারো বারোটা বাজল। কই পামু কও? পান লইয়াই বইয়া থাকো ছায়েব, ভাণ্ডে চুন নাই। কইতে গেছি অপারগের কথা, বন্দুকের ডগা দিয়া না মারিয়া কুন্দা দিয়া মারছ্যে। একই অবোস্থা আমার— খুলিটা আর আস্তা নাই। বাড়ির থিক্যা বাইর করিয়া দিছে। চাকরিডা শ্যাষ করছে এক কলমে—'

হঠাৎ গলা নামাল চাজা—খাদ্য-খরচ কত?

লাফিয়ে উঠল মারফৎ। তেমন জিনিস হলে ইনাম— সে

একটা প্রকাণ্ড টাকা। কানে-কানে বলল মারফৎ। দালালির ভাগ নেবে না সে। তার চাকরিটি বজায় থাকে, এই তার যথেষ্ট দালালি।

ফারাক হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আছে পঞ্চমা। চাজা একবার তাকালো তার দিকে। এই অলপ্পেয়ে অলক্ষ্মী মেয়ে দিয়ে তার কি হবে? এক পয়সার সাশ্রয় করতে পারল না! শুধু উড়নচড়ে হয়ে ঘুরে বেড়ানো।

এমনিতেও খাস্ত, অমনিতেও খাস্ত। তবে মিছিমিছি শস্তায় বিকোনো কেন?

চাজা রাজি হয়ে গেল।

ভাঁওতা দিয়ে পঞ্চমাকে নিয়ে আসা হল ডাকবাংলায়। কঠিন একটা কিছু শাস্তি তাকে নিতে হবে, এমনি একটা কিছু আঁচ করেছিল সে। পাকা-পোক্ত কোনো ঘরে চির-কালের জন্যে আটকে রাখবে হয়তো। হয়তো কুড়ি পেরোবার আগে আর ছাড়া পাবে না।

কিন্তু এমন ভীষণ একটা কিছু হবে, এ সে কল্পনাও করতে পারেনি। এর চেয়ে জ্যান্ত বাঘের মুখে ফেলে দেওয়া ভালো ছিল। ঢের ভালো ছিল খণ্ডখণ্ড করে কেটে ফেলা।

এমন কাণ্ড সাহেব পর্যন্ত আন্দাজ করতে পারেনি।

প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার ক'রে উঠল পঞ্চমা। কিন্তু

অত দূরে, বসতির বাইরে, নির্জন নদীর নিরালায় কে শোনে সেই আর্তনাদ?

কিন্তু কান খাড়া করে চাজা তো একবার শুনল।

ধমকে উঠল মারফৎ সেখ: 'তুই আর দাঁড়াচ্ছিস কেন? মুঠ ভরে টাকা পেয়েছিস, একটা বোতল পেয়েছিস আস্ত, সটান বাড়ি চলে যা। ফজরে পাঠিয়ে দেব মেয়েকে।'

চার

সেই রাত কখন পোহালো খোঁজ রাখেনি চাজা।

পঞ্চমা আর বাড়ি ফিরতে পেল না। লঞ্চে করে সাহেব তাকে নিয়ে এল সদরে। সেখানে লুঙ্গি ছাড়িয়ে ফ্রক পরালে, জুতো পরালে— এমন এক পিঠ সোনার চুল— তাও ছাঁটালে ঘাড় ঘেঁসিয়ে। মেমসাহেব বানালে। অবশেষে চালান করে দিলে কলকাতায়।

আর এই কলকাতায়, ওয়েলেসলির ওদিকে, একটা কুচ্ছিত গলিতে গুমসা বাড়ির মধ্যে সতীশ কাউরের সঙ্গে তার দেখা হল।

সতীশ তালাপাড়ার হরিশ কাউরের ছেলে। মগপাড়ার বন্দরে নতুন মনিহারী দোকান দিয়েছে, তাই সওদায় এসেছিল কলকাতায়। উঠতি বড়লোক হয়েছে, তাই এখন ওড়বার সখ। একটু না বখলে যেন বড়লোকির মানে হয় না। আর বড়লোকিটাও বেশ উঁচু জাতের। দেশী জিনিসে

৩

মন ওঠে না, তাই বিলিতির খোঁজে এসেছে এ-পাড়ায়।

ঠিক ষোল আনা হবে না। ছ-সাত আনা হতে পারে।

কি, ট্যাঁস ফিরিঙ্গি ?

না, বর্মী।

মন্দ কি, মনে-মনে হিসেব করল সতীশ। যা নতুন না-জানা তাই ষোল আনা।

ঘরে ঢুকেই সতীশ বললে, 'তুমি তো বর্মী নও, তুমি মগনি। তাই না ?'

পঞ্চমা হাসল করুণ করে। বললে, 'উঃ, কেমন করিয়া বুঝিছে !'

আহা, সেই মগী বাংলার টান ! সেই অপরূপ মিঠানি ! বুকের ভিতরটা আনচান করে উঠল সতীশের। হাত বাড়িয়ে হাত ধরল পঞ্চমার। 'আরে, তুমি যে দেখি আমাগো দেশদেশী মানুষ। কও এখানে আইলা কেম্‌নে ?'

'সেই কস্তের কথা হুনলে তোমরা কাঁদিবে।' দু'চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল পঞ্চমার। যেন কত কালের চিন-পরিচয়ের লোক এমনি ভাবে অকপটে বলতে লাগল তার দুঃখের কথা, তার অপমানের কাহিনী—

আর সেই ভাঙা-ভাঙা মগী বাংলায় চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই মেঘলা আকাশ, ফণা-তোলা নদী, ঢেউ-খেলানো অঢেল ধানখেত।

ঝাপসা গল্প-কথা যা শুনেছিল সতীশ, তাই এখন এই ঘরের দেয়ালে স্পষ্ট অক্ষরে লিপিবদ্ধ ইতিহাস !

যে মেয়েকে নিয়ে সমস্ত মগ-মুলুকে কলঙ্কের আগুন জ্বলেছিল সেই এখন একটি মলিন বাতি হয়ে মিট-মিট করছে !

হঠাৎ সতীশ পঞ্চমার দুই হাত আঁকড়ে ধরল : 'এই ইট-ইমারতের দেশ ছাড়িয়া যাইবা সেই নিজের ছ্যাশে ?'

পঞ্চমা হাসল।

'ছিলাম রাজকন্যা, এখন হয়েছি জলার পেত্নি, আমাকে কে জায়গা দেবে ?'

'আমি জায়গা দিমু। আমার লগে থাকবা—'

পঞ্চমা মাথা হেঁট করে রইল।

কিন্তু এমন কীর্তি করতে পারলে কত উঁচু মাথা সতীশের ! কত নাম-ডাক ! কত বড় কেরামতি ! জেলার ইংরেজ কলেক্টর যাকে এক দিন গুম করেছিল তাকে সে উদ্ধার করে এনেছে ! উদ্ধার করে এনেছে তার নিজের দেশে, নিজের এলেকায়। আর কেউ জায়গা দেবে না, সে দেবে। রাখবে তার নিটুট হেপাজতে। থাকবে বুক ফুলিয়ে, ডঙ্কা মেরে।

কত বড় সুনাম ! দুর্নামের সুনাম ! দুর্নাম না হলে বড়লোক হবার মাহাত্ম্য কি !

'কি, কথা কও না দেখি। ডর করে না কি আমারে ?'

না, পঞ্চমার আবার ভয়-ডর কি। সে বাঘের সঙ্গে লড়েছে, কালকেউটেদের সঙ্গে। মানুষের কোনো বিশ্বাস-ঘাতকতায়ই তার আর ভয় নেই।

'তবে? নিজের দ্যাশে ফিরতে সাধ হয় না?'

আথাল-পাথাল করে। এত দিন কেউই শোনায়নি তাকে তার দেশের কথা। তার যে একটা গত জীবন ছিল তার আনন্দের কথা। সেই সুতো ধরে আবার কি তার সেই আশার রাজ্যে, স্বপ্নের রাজ্যে ফিরে যেতে পারে? তা কি সম্ভব?

টলটলে ভাসা-ভাসা চোখ তুলে তাকাল পঞ্চমা। বললে, 'আমরা লইতে মনা আছে?'

কি বলো! মন নেই তো তোমার কাছে এসেছি কেন? কেন বসে আছি এতক্ষণ?

'আমরা বিয়া লইবে তোমরা?'

এ আর বেশি কথা কি! এ তো আরো জমকালো হবে! একসঙ্গে থাকতে পারব, আর ঐ একটা ঘটা করতে পারব না? বরং ঐ ঘটাটা হলেই তো ঘটনাটা আরো চমকদার হবে।

'করমু, বিয়া করমু তোমারে।'

বিয়ের নামে গলে গেল পঞ্চমা। বুকটা ভরে উঠল। কত দিন থেকেই তার একটা বিয়ে পাওয়ার সাধ। কতদিন থেকে!

বিদেশীর হাতে তার জাত ভেঙেছে। কোনো মগের সঙ্গে আর তার এলাকা চলবে না। এখন যাদ আর কেউ বিদেশী তাকে আশ্রয় দেয়, তবেই সে ছাড়া পায় এ দেশ থেকে।

সতীশ বিদেশী কোথায়? এক ভাষায় কথা বলে তারা। থাকে পাশাপাশি গাঁ-গেরামে। হাল-চাল সব জানাশোনার মধ্যে। ও তো বান্ধব!

এক দিনেই তো আর বিশ্বাস হয় না! ঘন ঘন যাওয়া-আসা করতে লাগল সতীশ।

'এত আওন-যাওনে কাম কি! আজিকালিই লইয়া চল।'

পোশাক পালটাল পঞ্চমা। ফ্রক ছেড়ে লুঙ্গি পরেছিল ফের, এবার লুঙ্গি ছেড়ে শাড়ি পরলে। কপালে-মাথায় সিঁদুর দিলে। পায়ে আলতা।

'আমরা তো আর তোমাগো দ্যাশের বাঙালী না, আমরা হিঁদু। আমাগো সিঁদুর পরলেই বিয়া।'

'হে আমরা জানিছে—' আহ্লাদ আর ধরে না পঞ্চমার।

পতিত ছিল এক নিমিষে হাসিল হয়ে উঠল।

ফিরে চলল দক্ষিণের চরে। তার নতুন সংসারে।

যে বন্দরে সতীশের মনিহারী দোকান সেই বন্দরে সে আলাদা ঘর ভাড়া নিলে। চার চৌহদ্দির বেড়া উঁচু করে

তুলে দিলে। মেরামত করালে ফাঁক-ফোকর। অন্দরের বউ করে রাখল পঞ্চমাকে।

চার দিকে ডামাডোল পড়ে গেল। সেই পঞ্চমা শহর ঘুরে সরম খুইয়ে বউ সেজেছে।

মগ-পাড়ার মাতব্বররা ফরমান ঝাড়ল, যদি কোনো পাড়ায় এসে সে ঢোকে তবে তাকে 'দাওয়া দিয়া কাটা করিব।'

তবু হাটে-ঘাটে এদিক-ওদিক সবাই উঁকিঝুঁকি মারে—যদি একটি বার দেখতে পায় পঞ্চমাকে। কেমন তার দশা হয়েছে দেখি। বিবি থেকে বউ হলে তাকে কেমন দেখায়!

কিন্তু, সূয্যিই তার মুখ দেখে না, বাইরের মানুষে দেখবে কি! ঘরের ছুটুলে বউর মতই সে পর্দার জিম্মায় বন্দী আছে।

চাষাভুষোর মেয়েছেলে তবু কেউ আসে তুপুরে। বলে, আমাদের কি। বিয়ে যখন হয়েছে বলছে, তখন এ তো গেরস্থ-বাড়ি। গেরস্থ-বাড়িতে ঢুকতে আপত্তি নেই। আলগা হয়ে বসে একটু সুখ-তুঃখের গল্প বলা শুধু।

কিন্তু কি গল্প করবে! পঞ্চমার কিছু বলবারও নেই, জানবারও নেই। একতরফা কতক্ষণ চোপা চালানো যায়!

না, বলবার কিছু না থাক, জানবার আছে। সেদিন অনুভব করল পঞ্চমা। যেদিন, মগ-পাড়ার আর কোনো জননা নয়, মঞ্চিন এল দেখা করতে।

'রূপা কোথায় আছে? বিয়ে করেছে?' সব কথা থুয়ে প্রথমে এই প্রশ্নই জিগগেস করলে পঞ্চমা।

রূপা? না, বিয়ে-থা করেনি। ফুঙ্গি হয়েছে। ঠিক গেরুয়া তো নয়, হলদে নিয়েছে। আফিং খায় আর ও-পাড়ার ঠাকুরবাড়িতে পড়ে থাকে।

খাওয়া-দাওয়া চলে কোথায়?

যেমন চলে ঠাকুরবাড়িতে। ঠাকুরবাড়ির পাঠশালাতে ছেলে পড়াতে হয় বৈ কি। তারা ফুঙ্গির জন্যে বাড়ি থেকে ভাত নিয়ে আসে। ছুটির দিন কাঠের কৌটো করে ভাত ভিক্ষে করে বেড়ায়।

ও সংসার ত্যাগ করলে কেন?

কে জানে!

ঠাকুরবাড়ি খালি পেল কি করে? আগের ফুঙ্গির হল কি? মরেছে?

না। ফুঙ্গি ভেঙে সংসারী হয়েছে। মিলেছে না কি মনের মতন মাতারি। হোক বুড়ি-ঝুড়ি, তবু মনের মতন!

কিন্তু তাই বলে তার জায়গায় ও বসতে গেল কেন? সংসারের সুখ ওর উঠে গেছে না কি? কেন এল ও এই কঠিন কষ্টের মধ্যে? ওর কিসের অভাব? কিসের অশান্তি?

'ওর কথা তোর কাছে কে বলতে এসেছে?' মঞ্চিন

বিরক্তিতে ঝাঁজিয়ে উঠল। পরে আবার স্নেহের ভঙ্গীতে নরম হয়ে বললে, 'শোন, আমি যার জন্যে এসেছি,—'

তোর বাপ তোকে ডেকেছে। নিশ্চয়ই ঘরে নেবে বৈ কি। মেয়েকে ফেলবে কোথায় ?

তবে সেই ঘর-দুয়ার আর নেই।

'কি হল ?' শুকনো চোখে তাকিয়ে রইল পঞ্চমা।

দেনার দায়ে নিলেমে বিক্রি হয়ে গেছে। জোত-জমিটুকু আগেই গিয়েছিল— এখন ঘর-দুয়ার গেল।

'তোমরা তবে এখন আছ কোথায় ?'

সেই কথাই তো তোকে বলতে এসেছি। তোর বাপ ডাক-বাংলার চৌকিদার হয়েছে। এক রকম তোর জন্যেই হল। তোর আশাতেই হল। বরাবরই বলে এসেছে, ফিরে আসবে পঞ্চমা। বাপ-মায়ের টান না থাক, মাটির টান থাকবেই—

দু' কানে দুই আঙুল দিল পঞ্চমা।

'তুই আয়। বাপের উপর রাগ করতে নেই। এখন আর রাগের আছে কি ! চল, স্বাধীন মতো থাকবি। তোকে ছাড়া চলবে না। আমাদের কি আর রূপ আছে, না বয়স আছে ?'

এমন কুকথা মুখে এনো না। আমি এখন বিয়ে বসেছি। স্বামী পেয়েছি। আমার ঘর-বাড়ি হয়েছে। যাও, নিজের পথ দেখ— আমার ঘরের মানুষ এখুনি এসে পড়বে।

বলে ঘরে গিয়ে কপাট দিল পঞ্চমা।

মঞ্চিন চলে গেলে আয়না নিয়ে বসল চুল বাঁধতে। সিঁথিতে মোটা করে সিঁদুর দিলে। কপালে বসালে মস্ত এক ভাঁটা।

তার পরে ঘরের এক কোণে যে ছোট্ট একটু পূজার আসন বসিয়েছে তার সামনে বসল সে শান্ত হয়ে। আর-আর দিন টিপ করে একটা প্রণাম করেই সে উঠে পড়ত। আজ, কেন কে জানে, চুপচাপ একটু বসল চোখ বুজে।

সে যে নতুন স্থান পেয়েছে, নতুন ধর্ম, তাই মনে-প্রাণে প্রমাণিত করতে সে ব্যস্ত।

সতীশকে বলেছিল, ঠাকুর নিয়ে আসতে হাট থেকে। সতীশ এক মাটির শিবমূর্তি নিয়ে এসেছে। বেশ, নাদুস-নুদুস আত্মভোলা মূর্তি। বেশ শান্ত সুস্থির মুখের ভাবটি। চেয়ে থাকতে-থাকতে প্রাণের ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়ে ওঠে। কিছু না-চাওয়ার না-পাওয়ার শান্তিতে ভরে যায়। মনে হয় এও যা, ফারাতারাও তাই।

এক দিন তাই জিগগেস করলে সতীশকে : 'উঃ, আমরা ফারাতারাকে তোমরা মানিছে ?'

সব মানি। আবার কিছুই মানি না।

'না মানলে তোমাকে ঘরে আনলাম কেন ? আর, যদি মানবই ষোল আনা—'

পাঁচ

কোথাও শান্তি নেই।

যুদ্ধ বাধলো।

দিকে-বিদিকে সৈন্য বেরিয়ে পড়ল দলে-দলে। শহরে-গাঁয়ে, চরে-বন্দরে। বাড়ি-দখলের হিড়িক পড়ে গেল।

বেশি পিড়াপিড়ি করতে পারে না, তবু আরেক বার মনে করিয়ে দিল পঞ্চমা। এবার একবার গেলে হত না শহরে? রেজেষ্ট্রি অফিসে? কাজির দরবারে?

তাই যাব আজ। রাত্রের ইষ্টিমারে। তুমি সাজগোজ করে তৈরি হয়ে থাকো।

সাজগোজ করে তৈরি হয়ে রইল পঞ্চমা। ইষ্টিমারে ভোঁ দিল। তবু সতীশের ফেরবার নাম নেই।

কি করে ফিরবে! বাড়ি-দখলের অর্ডার হয়ে গেছে আজ থেকে। দু'জন অফিসরের থাকবার জায়গা হয়েছে

এখানে। সত শ শুধু শূন্য বাড়ির দখল দেয়নি, মালামাল সহ দরবস্ত হক-হকুকের দখল দিয়েছে।

বাড়ির দাম পরে মিলবে, অস্থাবরের দাম নিয়েছে আগুড়ি।

সেবার কেঁদেছিল ভয়ে, এবার কাঁদল দুঃখে। যন্ত্রণায়। প্রবঞ্চনায়।

মানুষের বিশ্বাসঘাতকতাকে আর ভয় করবে না এমনি স্পর্ধা করেছিল পঞ্চমা। কিন্তু মানুষের বিশ্বাসঘাতকতার কী চেহারা তা সে কল্পনা করতে পারেনি।

ছাড়া পেলে শেষ রাতের দিকে। পিছনের দরজা খুলে পালাল আলগোছে। কোথায় যে যাবে কিছুই জানে না। সামনে যে একটা ঝোপঝাড় পেল তার মধ্যে গাঢাকা দিলে।

ভোর-ভোর রাতে রওনা হল সামনের পথ দিয়ে। একেবারে নাক-বরাবর। যেখানে গিয়ে পৌঁছয়।

পৌঁছুলো গিয়ে শোরাপাড়ার ঠাকুরবাড়িতে।

তখনো ভোর হয়নি স্পষ্ট হয়ে। পাখি-পাখালি ডাকতে সুরু করেনি। দেখল, ঠাকুরবাড়ির মেঝের উপর অঘোরে ঘুমুচ্ছে রূপা।

পায়ের কাছে বসল পঞ্চমা শান্ত হয়ে বসল চুপ করে।

শরীরে অসহ্য ক্লান্তি, অসহ্য যন্ত্রণা— তবু মনে হ'ল আর দুঃখ নেই, ভয় নেই— কিছু চেয়ে না-পাওয়ার দুঃখ, কিছু

পেয়ে হারানোর ভয়। যেন আর লাঞ্ছনা নেই, বঞ্চনা নেই। অন্তরে শুধু নীরবতা আর নিবৃত্তি।

তাকাল একবার বুদ্ধমূর্তির দিকে। নীরবতা আর নিবৃত্তির দিকে।

কতক্ষণে ঘুম ভাঙবে না-জানি রূপার! ধৈর্য ধরে বসে রইল পঞ্চমা। ঘুম ভাঙার প্রতীক্ষা করতে লাগল।

লোকজন আর নেই ঠাকুরবাড়িতে। এদিক-পানে সুরু হয়নি হাঁটা-চলা। সবখানে শুধু ধৈর্য আর স্তব্ধতা। কতক্ষণে সূর্য উঠে পড়ে সমারোহে। কতক্ষণে ঘুম ভাঙে।

যদি আর একটু ধৈর্য ধরতে পারত পঞ্চমা। যদি আর দেড়-দুই বছর! কুড়ি যদি পুরতে দিত! সেই তো এল ঠিক মন্দিরে, কিন্তু কী ভাবে কি হয়ে এল!

তাকাল আরেক বার ঠাকুরের দিকে। কত কাল ধরে বসে আছে ধৈর্য ধরে। সমাহিত হয়ে!

ঘুম ভাঙল রূপার! কিন্তু চোখের সামনে এ কে!

'আমি। পঞ্চমা।'

'তা জানি। জানি, আমি যখন ঠাকুরঘরে এসেছি তখন তুমিও আসবে। আমাদের ঠাকুরঘর ছাড়া আর জায়গা নেই।'

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল পঞ্চমা।

'তোমার কুড়ি বছর এখন পেরিয়ে গেছে, না? সেই কুড়ির পরও আমাদের আবার দেখা হল।'

ফুঁপিয়ে উঠল পঞ্চমা।

'এমনটা হল কেন জানো? ধৈর্য ধরতে পারিনি বলে। সংযম যদি বা ছিল, ধৈর্য ছিল না। কিন্তু তার জন্যে দুঃখ কি? কান্না কিসের? এখনো ঢের সময় আছে ধৈর্য ধরবার।'

আমি এখানে থাকব। ঠাকুরঘরে— ঠাকুরঘরের দাসী হয়ে।

নইলে আর যাবে কোথায়? আমি ছাড়া আর কে তোমাকে রক্ষা করবে? ঠাকুরঘর ছাড়া আর কে দেবে তোমাকে অব্যাহতি?

'কিন্তু বলো, ঠাকুরঘরের দাসী নয়, ঠাকুরের দাসী।'

'ঠাকুরের দাসী।' আবৃত্তি করল পঞ্চমা।

ঠাকুরই আরাম দেবেন, আরোগ্য দেবেন, নব জীবন দেবেন।

'নব জীবন সত্যি চাও পঞ্চমা?' পরিপূর্ণ স্নেহে পঞ্চমার মুখের দিকে তাকাল রূপা: 'তবে বলো তো, ফুঙ্গি ভেঙে দিই? ফিরে যাই সংসারে। আজ আর আমাদের কে ঠেকায়, কে আটকায়।'

তেমনি প্রগাঢ় স্নেহেই দৃষ্টি প্রত্যর্পণ করল পঞ্চমা। বললে, 'না। আমাদের নব জীবন এই ঠাকুরঘরে। বুদ্ধদেবের পদতলে।'

এও কি হয় ?

না হয় তো যা হয়—

যেটুকু হয় তাই হতেই বা দোষ কি ? আর কেনই বা হবে না সবটুকু ? যদি এতটুকু হয় সবটুকুরই বা বাকি কি ?

'ওগো বাবা গো, ওগো মা গো—' হঠাৎ একটা চীৎকার ছুটে এল মাঠের ওধার থেকে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কালীপদ।

আবার চীৎকার : 'ওগো বাবাগো, ওগো মাগো, ধরগো শিগরি—'

তাকাতে লাগল চারজনে। হৈ-হুজ্জুত বাধল নাকি আবার কোথাও ?

না, এ তো জামিলার গলা। কি হলো কে জানে।

শুকনো মাঠ, ডেলা-পাকানো। তারই উপর দিয়ে পায়ের পাতা ফেলে-ফেলে এঁকে-বেঁকে ছুটে আসছে

জামিলা। আর ছুটে আসছে কিনা কালীপদরই দিকে।

'ধরগো ধর— সব খেয়ে ফেললে গো— কি হবে গো—' আঁচলে-কষিতে ঝটাপটি করতে-করতে আরও এগিয়ে এল জামিলা। পথের কোন রাহী লোকের দিকে মুখ করে বললে, 'তুমি দেখতে পাচ্ছনা গা— তুমি কি কাণা ?'

পথের কোন লোককে জিগগেস করছে ঠিক কি।

'বাছুরে বাঁট চুষে সব দুধ খেয়ে নিলে দেখতে পাচ্ছ না ? গাই-বাছুরকে ঠাঁইনাড়া করে দিতে শেখনি ? গরিবের ক্ষেতি করিয়ে সুখ কি ?'

ওমা ! তুমি ? একি পোশাক ? একি চেহারা ?

লটাপটি করে চুল বাঁধল জামিলা। শরীরের আনন্দ-টুকুকে কোথায় রাখবে, কোথায় ঢাকবে বুঝতে পারে না।

'আমি বৎ করছি যে এ বছর।' কালীপদ লম্বা চোখে তাকিয়ে থাকে। 'ভক্ত হয়েছি।'

সে আবার কি ? বাছুরটাকে এক ঠেলায় সরিয়ে দিল জামিলা। কই, শুনিনি তো কোনো দিন। বৎ আবার কোন দিশি ?

বাবা-ভোলার বৎ করি। বৎ জান না ? বত্ত, বর্ত্ত। মায়ে-ঝিয়ে বর্ত্ত করে, যার যার বর সেই-সেই মাগে— শোননি ?

থাক, আর শোনাশুনিতে কাজ নেই। কিন্তু বেটাছেলের আবার বর্ত্ত কি গো ?

বা, বেটাছেলের বুঝি সাধ নেই? কিছু অপূরণ নেই তার হিয়ের মধ্যে? ভগমানের কাছে মাঙবার নেই কিছু দুনিয়ায়?

কে জানে। কিন্তু তোমার হাতে ওটা কি?

'বেত। একে বলে দ্বাদশ। দেখতে পাচ্ছ না, বারোটা চোখ। তার মানে বারো সুজ্জির তেজ। বড় জাগ্রত দেবতা।'

'আর গলায় কি ওটা?

'ওমা, তাও জান না? উত্তুরে। এক ছুটে কাজ করতে নেই, তাই দু ছুট।'

'কদিন চলবে এমনি সং সেজে?'

এগারো দিনের ভক্ত আমরা। আমরা কেওট, ভল্লা, রাজবংশী—

'বা, বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু তোমাকে—' দুই চোখে এক চলক খুশি উথলাল জামিলার।

'আর তোমাকে?'

'তা তুমি জান। আর তোমার ঐ বাবা জানে।'

'কালাস্তি রুদ্দুর।' কপালে জোড় হস্ত ঠেকাল কালীপদ। 'বাবা যদি একবার মুখ তোলেন তা হলে পাথর ফেটেও দুধ পড়ে।'

'খাও কি?'

এক পাকে সিদ্ধ-পক্ক যা হয়, তাই— একবার। আর বার ফল-জল।'

'দুধ খাবে? ঘরুটে গরুর দুধ?'

'পাই কই?'

'দাঁড়াও—' চারপাশে তাকাতে লাগল জামিলা: 'একটা ভাঁড় জোগাড় করতে পার? একটু দুধ দুয়ে দিতাম তোমাকে।'

'বল কি? জোগানে যে কম হবে তোমাদের।'

'হলে হত। বলতাম, বাছুরে খেয়ে নিয়েছে।'

'না গরিবের ক্ষেতি করিয়ে লাভ নেই।' এগুলো কালীপদ।

'যাচ্ছ কুথা?'

'গাজন খাটতে যাচ্ছি।'

ঘাটে যাচ্ছি। আমরা দেয়াশিন পাতা। তার মানে, অশন-বসন জোগাই আমরা— আমরা ভাণ্ডারী। তুমি ও-সব বুঝবে না কিছু।

না, বুঝব। কেন বুঝব না? তোমরা বুঝের জিনিসে আমার কেন অবোধ হবে?

সুয্যি অস্ত গেলে স্নান করি সবাই। ঘাটের পাহাড়ে বেতের ছড়িগুলো গাদা দিয়ে রেখে দিই। চাক বাজে, টিকিরি বাজে। নাচ করি তখন। মাথা নেড়ে তালে-তালে

ঠিক ভরন দিয়ে একবার লাঠির গাদার দিকে এগুই, আর একবার পিছুই। কখনো দেখনি বুঝি তুমি? গেলেই পারো একদিন।

'আমাকে দেখতে দেবে?'

'কেন দেবে না? তুমি তো দূরে দাঁড়িয়ে দেখবে। ছোঁবে না তো কাউকে।'

'তোমাকে যদি এখন ছুঁই?'

'ছোঁও না। এখনো তো চান হয়নি আমার।'

'চান করার পর?'

'তখনকার কথা আলাদা— তখন তো আর—' প্রশ্নটা কালীপদর ভাল লাগল না।

'তারপর বুঝি মদ খাবে?'

মুহূর্তে কালীপদর মুখের মরা-মরা ভাবটা কেটে গেল। বললে: 'মদ খেলে মন খুব সরল হয়। উতলা উল্লাস হয়। জাত-বেজাত থাকে না। সবাই আপনার হয়ে যায়। ছোঁয়াছুঁয়ি চলে যায়। তুমি খাওনি কোনোদিন মদ?'

'ধ্যেৎ।'

পাশাপাশি পাড়া— নিকিরি শেখের পো-রা আর ওই ধীবর-কেওটরা। মাঝখানে একটা কাঁদর। ঝগড়া মারামারি আছে আবার সুখও আছে।

কিন্তু মঞ্জুর খাঁর সঙ্গে নাথু কেওটের বড় বিতণ্ডা। প্রায় দা-কুমড়ো সম্পর্ক। কেউ কাউকে দেখতে পারে না। নাম শুনলে চিড়বিড় করে উঠে।

বরাবর কিন্তু এমনটি ছিল না। এককালে গলায় গলায় ভাব ছিল ছুজনের। এ কাশী যায় তো ও-ও কাশী যায়। ও মক্কা যায় তো এ-ও মক্কায় চলল। এত দোস্তালি। তখন জামিলা-কালীপদ ছোট। সেবার জামিলার বিয়ের সময়ও কত মাছ জুগিয়েছিল নাথু। কালীপদর জ্যাঠার শ্রাদ্ধের সময় মঞ্জুর খাঁ। যেমন একই নদীতে জেলাই করত তারা, তেমনি তাদের মন প্রাণও হয়ে গিয়েছিল এক নদী, এক খেয়া। জালও এক, জলও এক।

কিন্তু জমিদারের দল বিরোধ বাধিয়ে দিলে। তাদের সরিকে সরিকে ঝগড়া, তাই তারা প্রজায় প্রজায়ও মিলমিশ রাখতে দেবে না। এক সরিক বিলি করল মঞ্জুর খাঁকে, আরেক সরিক নাথুরামকে। তাদের অংশের গোলমাল মীমাংসা করতে চাইল নাথু মঞ্জুরের মধ্য দিয়ে। একটা পুকুরের জেলাই-স্বত্ব নিয়ে মামলা, কিন্তু ছু বাড়ির উঠোনে ছু-ছুটো পুকুর কেটে ফেললে তারা। আগে ভরল রক্তে, পরে ভরল চোখের জল দিয়ে।

সোয়ামীর গাঁয়ে থাকতেই সব খবর পেত জামিলা। যমযন্ত্রণা পেয়ে বেধবা-বেওয়া হয়ে দেশে-গাঁয়ে ফিরে এসে

দেখে এই অবস্থা। আগুন নিবেছে বটে কিন্তু হলকা ধায়নি . বাতাস পায় তো আবার মেতে ওঠে।

উঠুক— ওতো শুধু তাদের বাপেদের কাণ্ড। তারা ছেলে-মেয়েরা, মা-বোনেরা ও সবের ধার ধারে না। তাদের খালে-বিলে যেমন সোঁত ছিল তেমনি থাকবে। ছু-ছুটো পুকুর কাটা যায় কিন্তু জল কখনো ভাগ করা যায় না। মাটির তলে তলে চলাচল করে।

ওদিকে পা বাড়িয়েছিল জামিলা— মঞ্জুর খাঁ হুমকে উঠেছিল : ও বাগে কি? ওরা আমার ছুষমন। খবরদার—

বুঝেছিল জামিলা। এ শুধু মামলায় হেরে যাবার জন্যে নয়। এ নয় যে তার নতুন বয়স হয়েছে। এ নয় যে সে বেওয়া। এ যেন এ-বাড়ি ও-বাড়ি নয়, এ একেবারে এ-মুলুক ও-মুলুক, এ-দেশ ও-দেশ। ছুটো আলাদা জাত-জন্ম। আগুন আর বাতাস নয়, আগুন আর জল। ছুজন ছুজনের ছুষমন। ওর গরু এর হারাম।

কিন্তু সব যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষে মানুষে শুধু একটুখানি মিল-মিশ সৃষ্টি করতে পারেন না?

কতটুকু কুটুম্বিতেই বা সম্ভব? তবু যতটুকু হয়। যতটুকু বা ছিল! তাই বা কম কি!

জামিলা মনে মনে হাসে। বম-ভোলা না হাতি! এত মুরোদ অথচ এক ঠেলায় পৃথিবীটা উলটে দিতে পারে না?

উলটে দিতে পারে না সমস্ত বিধি-বেপার, সমস্ত আইন-কানুন? পশু-পাখির মতই তো মানুষ তার সৃষ্টি, মানুষের বেলায় কেন এত গোনা-গাঁথা, কেন এত গরমিল? এত ভাগাভাগি, এত বাঁটোয়ারা?

'মাঠের দিকে গিয়েছিলি কেন?' মঞ্জুর খাঁ ধমকে ওঠে।

'গরু দিয়ে কালীপদদের কলাইয়ের ক্ষেত তছরুপ করেছি বাজান।'

'বেশ করেছিস।'

মা জিগগেস করে: 'কোথায় যেছলি?'

'কান্দরে বান এসেছে দেখতে যেছলাম।'

'ভিজেছিস কেনে?'

'কালীপদদের সেই সরফুলি বাটিটা চুরি করেছিলাম না? সেটা কাদায় পুঁতে রেখে এলাম।'

'বেশ করেছিস।'

কাঁদরে দাঁড়িয়ে গাজন-খাটার নাচ দেখছিল জামিলা। কি মাতন রে বাবা! হটতে হটতে পা হড়কে পড়ে গিয়েছিল জলের মধ্যে। ধর-ধর তোল-তোল, সবাই হৈ হৈ করে উঠল, কিন্তু সবার আগে ছুটে এল কালীপদ।

চারপাশে ভিড় দেখে ঝাঁজিয়ে উঠল জামিলা: 'আমি বেওয়া মানুষ, আমাকে ধর তোমার সাহস কি?'

'যে সাহসে তুমি পড় সেই সাহস।'

'আজ বাদে কাল আমার নিকে হবে— দেশান্তরে চলে যাব। ছাড় ছাড়—'

'এখন চোত মাসের নদী। জল নাই ধারা নাই। যদি থাকত তো ভেসে যেতাম। ফিরতাম না। মনান্তর না হলে আবার দেশান্তর কি?'

'পাগল! যেখানেই যেতে সেখানেই সেই দুই মানুষের বাসা। এক দিকে ঈশ্বর আরেক দিকে আল্লা। রফা নাই রেয়াৎ নাই, মিট নাই আপোস নাই। কি বলো তো!'

কোথায় পাব সেই নির্মানুষের দেশ! কোথায় পাব সেই হাওয়া-খাওয়া মাঠ!

পাবে না যখন ভালো মানুষের মত ছেড়ে দাও। ঘরের মেয়ে ঘরে গিয়ে বন্ধ হই। তুমিও জাত বাঁচাও। বাবা-ভোলার মান রাখ।

বাবা ভোলা না বোবা ভোলা!

তোরা কিসের ভক্ত রে ছিরু?

আমরা মালার ভক্ত। বাবাকে গোড়ের মালা জোগাই। টগর আর রক্তকরবীর। আমরা বৈরাগী। আমাদের সাত দিনের উপবাস।

আর তোরা ?

আমরা স্যাকরা। আমরা সিদ্ধির ভক্ত। সিদ্ধির গোটা গাছ— একেবারে জঙ্গল নিয়ে এসেছি। বাবাকে ঢেকে দেব, গাছ দিয়ে। বাবা যে সিদ্ধিপ্রদ।

'বলিস কি ? সব সাধ মেটাতে পারে বাবার সাধ্য আছে ?' কালীপদ তাচ্ছিল্যের ভাব করে।

'পারে বৈ কি।'

'যে গাছে শাদা ফুল ধরে সে গাছে লাল ফুল ফোটাতে পারে ? রাতারাতি জাত বদলিয়ে দিতে পারে গাছের ?'

'গাছের পারে না, কিন্তু মানুষের পারে।' বললে যুগল-মির্ধাদের একজন।

বলে কি সর্বনাশের কথা! মানুষের জাত-জন্ম সব একাকার করে দিতে পারে ?

নতুন ভক্ত হলি এই বছর। তুই বাবা ভোলার সামর্থ্যের খবর জানিস কি ? কণা-কণা সিদ্ধির পাতা বিলোনো হবে জনে-জনে, তাই নিয়ে যাস এক রেণু।

রেণু কেন, গোটা গাছ খেতে পারি শিলে বেটে।

ওরে, অপ্পেয়ে, খেতে হয় না, কাপড়ের গিঁটে বেঁধে রাখতে হয়।

যুগল-মির্ধারা কুলের কাঁটা বুকে নিয়ে গড়াচ্ছে মাটিতে। অফলা কুলের গাছ। জীবনে বোধ হয় ফল পায় নি কিছুতে,

তাই কাঁটার দাগ নিতে বুক চিরে-চিরে দিচ্ছে। যদি এবার কিছু সুফল ফলে।

কালীপদের মনে হল এমন কিছু করলে যদি হয়! বুক চিরে রক্ত না দিলে বাবা শুনবে কেন? শুধু একটা ইচ্ছে হলেই বাবারো ইচ্ছে হবে? তা কখনো হয়?

কুলের কাঁটা কেন, ইচ্ছে হল পাথরে মাথা ঠোকে, মুখ ঘসে, ঘাস-মাটি আঁচড়ায়-কামড়ায়। তবে যদি কালারুদ্দুরের দয়া হয়।

বাজে কথা। জাত বদলানো অসম্ভব। যে দেয়াশিন, সেই যুগল-মির্ধা হতে পারে না। জামিলা তো কোন ছার!

এত মানুষ, দুটো করে হাত পা, চোখ-কান, জাত-জিনিসটা কোথায় লেখা আছে জিগগেস করি? একই তো রক্ত, একই তো কান্না। জাত যদি আলাদা, হাত দুটো তবে আলাদা হয় না কেন? কেন এক হাত আরেক হাতের মধ্যে ধরা দিতে হা-পিত্যেশ করে?

তার চেয়ে কালীপদ শাদা ফুলের গাছে লাল ফুল চাক! তা ঢের সরল।

গোল নাচ নাচছে গয়লারা :

রাত পোহালে বাবা ভোলা
করবে আলা হোম-তলা
লোকে দেবে পূজো-পালা
(বাবা) নদীর জলে করবে খেলা।

লোক সরিয়ে দিচ্ছে সীমানাদার। এক দলের জায়গা আরেক দল না চেপে বসে। মারামারির রাত। ব্রতভঙ্গের রাত। যত রকম ভক্ত সব জড় হয়েছে মন্দিরে। সারি-বোলান হচ্ছে, হচ্ছে পাঁচালি-কীর্তন, চলছে ঢোল-তবলা-হার্মোনিয়ম। ধুমুল পড়েছে চারিদিকে। অগ্রদানী হাঁক পেড়ে ডাকছে ভক্তদের। তার হাতে আবিরের ফোঁটা নেবার জন্যে কাড়াকাড়ি লেগে গেছে।

কত জনের কত সাধ। কত মানৎ। কালীপদর মত সৃষ্টিছাড়া বুঝি কেউ নয়।

লাউসেনরা কুমড়ো-লাউ নিয়ে এসেছে। ধুপসেনেরা ধুলো বিলোচ্ছে চারধারে। যারা মায়ের পাতা, তারা কালীর মুখোস পরে ডাকিনী-যোগিনী সেজে নাচছে। দাঁত-বার-করা শোলার গয়না পরেছে সর্বাঙ্গে। এলানো চুল, ফাঁপানো ঘাগরা— মুখ কটা আবির-মাখা। সব শুদ্ধু ষোল জন বোধ হয়। ষোড়শমাতৃকা। ওরা কি চায়? পুষ্টি-তুষ্টি? না, জয়-বিজয়?

ওরে বাবা, ওরা চামুণ্ডার পাতা! শকুনি-গৃধিনী খেলছে। মাঠে বা গোপথে-ভাগাড়ে মরা পশু-পাখি নিয়ে শকুনী-গৃধিনীরা যেমন কাড়াকাড়ি করে তেমনি ঝটাপটি করছে ওরা। ক্যাঁ-ক্যাঁ আওয়াজ করছে পর্যন্ত। উবু হয়ে বসে কখনো বা মাটির উপর বুক দিয়ে পড়ে দুই হাত-পায়ের শব্দে

পাখসাট দিচ্ছে। একবার এগুচ্ছে আর বার পেছুচ্ছে, কখনো বা ঘাড় তুলে লম্বা করে হেলাচ্ছে-দোলাচ্ছে।

'ওমা, তুমি এখানে!'

ভিড়ের মধ্যে জামিলা। ভয়েতে ভর-ভর মুখ, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে গা ঢাকা দিয়ে।

'তুমি এখানে কেন? ভারি ভয়ের খেলা এখন। বাড়ি যাও।'

'আমার সে ভয় নয়।' জামিলা একটু হাসে।

জামিলার ধরা-পড়ার ভয়। কিন্তু কালীপদ ছাড়া তাকে আর এখানে চেনে কে! কে বা বুঝবে কেন এসেছে!

কিন্তু অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে কোনো লাভ আছে? মাঝখান থেকে, লোক-জানাজানি হয়ে গেলে অপমান করবে সবাই।

করুক। অপমানের আর বাকি কি। তোমার বাবা চোখ বুজে আছেন, থাকুন তেমনি। তাঁর দিকে আর তাকাচ্ছি না। মড়া নিয়ে আসবে যারা তাদের খেলা দেখবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। আসবে না তারা?

কী সর্বনাশ! ঐ খেলা সইতে পারবে তুমি? ভয়ে চোয়ালের খিল আটকে যাবে না?

আমার চেয়ে তোমারই তো বেশি ভয়। রাজ্য-সিংহাসন

কিছুই ছাড়তে পার না। ছাড়তে পার না তোমার ঐ কালারুদ্দুরকে।

কে কি ছাড়ে বলো? কেউ কিছু ছাড়ে না। যদি একজন না জোর করে ছাড়ায়।

জোর করে বোলো না। কৃপা করে ছাড়ায় বলো।

রোল উঠেছে ভিড়ের মধ্যে। কি ব্যাপার রে বাবা? জামিলাকে চিনে ফেলল নাকি?

না, না, তা নয়। কালকে-পাতারা মড়া নিয়ে আসতে পারবে না এ বছর। পাখমারার ডোবে মড়া খুঁজে পাওয়া যায়নি নাকি। তাগ বুঝে কেউ মরেওনি এই সময়টায় যে কাঁধ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবে। শ্মশান পর্যন্ত শূন্য।

তারি জন্যে নৈরাশ্যের চাঞ্চল্য উঠেছে চার দিকে। মড়া নাচাবেনা এ বছর— বাবা ভোলা হল কি! এত নিস্তেজ হয়ে গিয়েছে! এত বিমুখ!

'তবে এবার ফিরে যাও।'

'তোমার হাতের লতুন কাপড়খানা আমায় দাও না।' হাত বাড়াল জামিলা: 'বাবাকে দিয়ে আর কি হবে?'

'ও তো শাড়ি নয়, তুমি করবে কি?'

'গলায় বেঁধে ঐ সামনের গাছটায় ঝুলে পড়ব। মড়া পাচ্ছে না নাকি, আমার দেহটা নিয়ে দিব্যি খেলা দেখাতে পারবে।'

কথাটায় যেন কত কষ্ট। কালীপদ দিয়ে দিল কাপড়-খানা। বাবার জন্যে এনেছিল, তাকে দিয়ে আর কি হবে? সংসার ভরা যার এত ঐশ্বর্য, তার ঐ একখানা কাপড়ে কি আসে যায়? তার চেয়ে মনের মানুষের গায়ে এই কাপড়-খানা গায়ের পরশের মতন লেগে থাক।

'কোথা গিয়েছিলি পোড়ামুখি?' জামিলার মা হুমকে উঠল।

'কালীপদর বাড়ির সবাই 'জাগরণে' গেছে, সেই ফাঁকে ওদের বাড়ি ঢুকে এই কাপড়খানা চুরি করে এনেছি।'

'বেশ করেছিস।' মঞ্জুর খাঁ আর তার স্ত্রী এক সঙ্গে হেসে ওঠে।

না, মড়া জোগাড় হয়েছে। বাঁশের খুঁটোর সঙ্গে খাড়া করে বেঁধে এনেছে তাকে। দু' হাত দু'দিকে মেলে ঠিক সোজাভাবে দাঁড়িয়ে আছে মড়াটা। মুখে সিঁদুর-আবির মাখা। গলায়-মাথায় করবী আর আকন্দফুলের মালা। কোমরে মালকোঁচা বাঁধা। ধূপধুনো পুড়ছে, ঢাক বাজছে, আর সেই বাজনার তালে-তালে বাঁশবাঁধা সেই মড়া নাচছে। সঙ্গে-সঙ্গে নাচছে সব ভক্তেরা। আর থেকে-থকে হুঙ্কার ছাড়ছে।

সমস্ত সংসারক্ষেত্র এবার শ্মশান হয়ে গেছে। এবার, বটুকনাথ ভৈরব, হে বিভূতিভূষণ, তুমি জাগো।

আর কেউ নেই, শুধু শিব আর শক্তি। পুরুষ আর প্রকৃতি। কালীপদ আর জামিলা।

ভয়ে সবাই ছুটে পালাচ্ছে, আবার ফিরে তাকাচ্ছে। ফিরে তাকাচ্ছে তো আবার চীৎকার করছে। বাড়ি পৌঁছেও বুকের ধড়ফড়ানি যাচ্ছে না।

কিন্তু কালীপদ নিশ্চল-নিষ্ক্রিয়। শক্তিশূন্য।

মড়া নিয়ে চলে গেল ভক্তরা। আবার লোকজন জড় হতে লাগল আস্তে-আস্তে। কিন্তু জামিলার আর দেখা নেই।

'ও কে, ও কে ঢোকে রুদ্রদেবের মন্দিরে?' হঠাৎ হাঁ হাঁ করে উঠল সবাই।

কী সর্বনাশ! ও যে চণ্ডাল। ও মন্দিরে ঢোকে কোন সাহসে?

ও জলকুমুরী। জটাধারী। এক পুরুষের বংশ ওদের। ব্রত করলেই ওদের জটা হয়। মন্দিরে ঢোকবার আজ ওদের নির্বিঘ্ন অধিকার।

তেমনি আজ বীরপঞ্চানন বাগদি। হাড়ি মশালদার।

সমস্ত অভাজনের দেবতা তুমি। সমস্ত জনগণের দেবতা। কিন্তু ভগবান, বলো, কেবল একজন কেন বাদ পড়ে? কেন তুমি সকলের হয়েও কালীপদর নও?

ওরা কারা নাচতে এসেছে আগুন নিয়ে ?

ওরা ব্রহ্মার পাতা, অশ্বত্থ যজ্ঞিডুমুর আর বেলকাঠের আগুন করেছে। শুধু তাই নয়, সেই আগুনের উপর গড়াগড়ি দিচ্ছে।

ব্রহ্মপদ কি আর অমনিতে মেলে ?

বলা-কওয়া-নেই, কালীপদ হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল আগুনের মধ্যে। গড়াগড়ি খেতে লাগল।

এ আবার কোন ভক্ত ?

আমি ভক্ত নই। ভক্তরা তো বাহিরে দগ্ধ হয়, আমি অন্তরে দগ্ধ হচ্ছি। অন্তর্দাহ মেটাবার জন্য বহির্দাহের শরণ নিলাম। তাই যদি এবার দেখেন বাবা রুদ্রদেব। আমি ভক্ত নই। আমি জ্ঞানপাপী।

ভোরবেলা জনগণের দেবতা রুদ্রদেব বেরুলেন শোভা-যাত্রায়। ময়ূরাক্ষীর তীরে হোমতলায় বিশ্রাম করে ফিরবেন আবার মন্দিরে— নিজ-নিকেতনে।

পথে তিনি পথিকের দেবতা। সমস্ত পথহীনের।

বারের বামুন বাবাকে কোলে করে এনে পালকিতে বসিয়ে দিলে। খোলা পালকি। জানলা-কপাট নেই, খিল-শিকল

নেই। যেই হাত বাড়াও ছুঁতে পার দেবতাকে। ঠেলা দিয়ে ভেঙে দিতে পারো তার কালনিদ্রা।

বাবার বিছানা-বালিশ এল। চামরবরদার চামর নিলে। বালিশে হেলান দিয়ে বিছানায় আলস্য রাখলেন গণদেব। সুরু হলো চামর খাওয়া। আবার কি ঝিমকিনি এল নাকি, না কি বাবা সব সময়েই ঘুমে?

পালকির আগে ঢাক, ঢাকের আগে নিশান, নিশানের আগে দগড়। কাঁধের ভক্তরা পালকি বইছে। এগুচ্ছে দু-পা দু-পা করে।

কাঁটাঝোপে আর ঝোড়জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বাবার রাস্তা। পুকুরের গাবা বা আঁস্তাকুড়ের পাশ দিয়ে। সাধারণের যিনি দেবতা তাঁর পথ এমনি অগম্য। ধুলোয়-কাঁটায় ভরা। তাই দিকে-দিকে ধুলো ওড়াও। সব বাবার পদরেণু। বাবার জয়-বিজয়!

হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে ইত্তিলোকের। বাবাকে দেখবে, বাবাকে ধরবে, বাবার বাহনে কাঁধ দেবে। সব এলাকা ভাগ-ভাগ করা আছে। কার ক চেন, কার ক রশি! কার কি পূজো-প্রণামী, তাও ঠিক হয়ে আছে। কার চাল-চিনি, কার ফল-জল, কার বা ফুল-দুধ।

আগে চল কুরুর পাড়া, পরে শাঁখারি পাড়া, স্যাকরা পাড়া, কায়েৎ পাড়া। তল্পিদার কই হে? মাথার ধামা

নামিয়ে নাও যা কিছু দেয় তারা মুঠো ভরে।

সারা পথ ধুলোয় অন্ধকার হয়ে গেল। আরো-আরো ধুলো ওড়াও। আমাদেরই মত আমাদের দেবতা আজ পথ দেখেছেন, পথ নিয়েছেন। বোলো— বাবা ভোলার নামে প্রীতিপূর্ণ করে হরি হরি বোলো— বোলো শিবো— বোম্—

সঙ্গে-সঙ্গেই ভক্তদের বেতে-বেতে ঠকাঠকি— কাঠিতে-কাঠিতে কটকটকট। বলো কোন গাছে ফল হয় না, লাঠি ঠেকিয়ে দিই। কার শক্ত অসুখ, লাঠির আচ্ছাদনের নিচে এসে দাঁড়াও।

এবারে মুচিপাড়ার হিসসা। ভাগাড়ের মুচিরা এসে ঠাকুরের গায়ে হাত বুলুতে লাগল। কত বঞ্চনার পর অঞ্চলে এল বলো তো!

তারপর মেথরেরা। নরক ফেলে তারা ঠাকুরকে তুলে নিলে কাঁধে। তাদের চৌহদ্দিটুকু পার করে দিলে।

এবারে এই পাকুড়গাছের গোড়ায় বাঁধানো বেদীতে ঠাকুর একটু বিশ্রাম করবেন। জানোনা বুঝি? এই জায়গার নাম বিশ্রামতলা।

বিশ্রামের পর আবার রওনা হলেন। এবার নবগ্রামদের কাঁধে।

তারপর এই এলাকাটুকু? ওই ঢিপিটার থেকে ঐ কাঁদরের পাড় পর্যন্ত?

হঠাৎ নিকিরিরা ছুটে এল। মঞ্জুর খাঁ, সাহাদাৎ শেখ, জুব্বারি মুন্সির দল। কি ব্যাপার ? মারপিট করবে নাকি ? ঠেকাবে নাকি ঠাকুরকে ?

না, আমরা কাঁধ দেব। কোলে নেব বাবাকে। এটুকু আমাদের ইলাকা। আমাদের সীমানা। মুসলমানদের।

বাবা ভোলার নামে প্রীতিপূর্ণ করে— রব উঠল, জয় উঠল চারদিকে।

তিরিশ-চল্লিশ গজ রাস্তা মুসলমানরা পালকি বইলে। ঠাকুরকে পার করে দিলে বুকে করে। যুগ্যি ছেলে যেমন বুড়ো বাপকে পার করে দেয়।

বেরিয়ে এল জেনানারা। দাঁড়াও, বাবা যখন আমাদের বাড়িতে। হাতের যত্নে তার সেবা করি, আঁচলে বাতাস করি তাকে। গরিব মেয়ের বাড়িতে এসে বাবার না কোনো ত্রুটি হয়।

হঠাৎ কালো কষ্টির গায়ে তীক্ষ্ণ একটা সোনার দাগ পড়ল যেন। কালীপদ চোখ ফিরিয়ে দেখল, জামিলার হাসি, জামিলার আনন্দ।

কত বড় জীবন্ত ঠাকুর দেখ। আমাদের তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বর আর আল্লা এক— আমরা এক বাবার সন্তান। কোনো ভেদ নেই, বাধা নেই। তুমি এক পুরুষ আমি এক মেয়ে। সারা সংসারে আমরা দুজন ছাড়া আর

কেউ নেই, কিছু নেই। আমি ছাড়া তুমি মিথ্যে, তুমি ছাড়া আমি শূন্য।

কালীপদ তাকাল একবার ঠাকুরের দিকে। ঠাকুরের চোখ কই! আশ্চর্য, জামিলার চোখের মধ্যে দিয়ে তিনি চেয়ে আছেন। দুটি বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ। আকাশ ভরা টলটলে নীলের ঢেউ।

হোমতলায় গিয়ে নিচের আসনে বসেছেন রুদ্রদেব। সবাই জল ঢালছে তার মাথার উপর, স্নান করাচ্ছে। জামিলা কালীপদও জল দিল। সবাইর-স্পর্শে-পবিত্র-করা জলে দেবতা পবিত্র হলেন।

শুধু জল নয়, দুজনে বাটা দিলে ঠাকুরকে। বটের পাতার ছোট ঠোঙাতে করে ফুল আর কলা আর আমের টুকরো। হোমাগ্নিতে আস্ত কলা আহুতি দিলে দুজনে। যদি দেয়াল-আড়াল ভেঙে দিলে বাবা, আবরণ-আচ্ছাদনও মুছে ফেল। জীবন পুরন্ত কর, ফলন্ত কর। অফুরন্ত কর।

কি মোহে আছে দুজনে, সন্ধ্যায় ঠাকুরের শীতল দেখলে, আরত্রিক দেখলে। রাতে শোল মাছ পোড়া দিয়ে খিচুড়ি ভোগ হল, তার প্রসাদ নিলে। আর ভয় কি! আর আপশোষ কি। বাবা আসন-বসন, শয়ন-ভোজন সব এক করে দিয়েছেন। আর কোনো ফাঁক-ফারাক নেই। তোমরা-আমরা নেই।

এক রাত্রি থেকে বাবা ফের ফিরে গেলেন ভোর বেলা। জামিলা-কালীপদ বললে, আমাদের আর ফেরা নেই। আমরা চললাম পালিয়ে। চললাম এগিয়ে। মিলিয়ে দেবার কর্তা তুমি, এগিয়ে দেবারও মালিক হয়ো। আকাশে বাতাসে না দেখি, দেখব তোমাকে আমরা আমাদের চার চক্ষুর মাঝখানে।

চলো, যাবার আগে বাবাকে একবার দেখে যাই, ছুঁয়ে যাই। সোনার অলংকার পরে সিংহাসনে বসেছেন বাবা, মাথায় চুড়ো, কাঁধে সাপ, হাতে ধুতরো আর কঙ্কন, গলায় হার আর পায়ে খড়ম, চলো দেখে আসি। পথের ঠাকুর সিংহাসনে বসেছেন। আমাদের প্রত্যহের চাওয়া চিরকেলে পাওয়ার মান পেয়েছে! এ কি কম কথা!

কে রে ওঠে মন্দিরের চাতালে? বারের বামুন গর্জে উঠল।

'আমরা।'

'কে তোরা?'

'আমরা আবার কে! আমি আর ও! মন্দিরে ঢুকে বাবাকে স্পর্শ করতে এসেছি।'

বারের বামুন আর তার শিষ্য-সাকরেদরা ঘাড়ে রদ্দা মেরে আঙন থেকে বের করে দিলে কালীপদকে। জামিলাকে দূর-দূর করে কুকুর তাড়ানোর মত করে খেদিয়ে দিলে।

কালীপদ বললে, ‘কাল যে বাবাকে দেখেছিলাম, ছুঁয়ে-ছিলাম, ধরেছিলাম—’

‘ঐ এক দিন।’

শুধু ঐ একদিনের স্বপ্ন। বাবা আবার অভিষেক করে উপরে উঠেছেন। শুধু এক দিনের জন্যে নেমেছিলেন নীচকুলে। মন্ত্রে শুদ্ধ হয়ে আবার সম্ভ্রান্ত হয়েছেন। বসেছেন তাঁর পাকা স্বত্বের জমিদারিতে।

‘তিনি আর আমাদের নন?’ শূন্যকে জিগগেস করলে কালীপদ।

‘কোনোকালেই আমাদের ছিলেন না।’ জামিলা চলতে চলতে সরে গেল অজান্তে। ‘যখন ফিরে গেছেন শুনলাম তখনই বুঝেছিলাম আমাদের ফিরতে হবে।’

‘বুঝেছিলে?’ জামিলার মুখটা হাত দিয়ে নিজের দিকে ঘুরিয়ে ধরল কালীপদ।

জামিলা চোখ বুজল। কালীপদর মনে পড়ল ঠাকুরের চোখ নেই। শুধু নিষ্ঠুর পাথরে নিষ্পলক অন্ধতা।

আরেক রকম

কালাচাঁদ বেদম মার খেল।

যত রাজ্যের ভয় তখন ঘিরে ধরেছে দুপায়ে। এ-পাশ ও-পাশ তাকাচ্ছ কি ঘন ঘন! থমকে দাঁড়াবার কিছু নেই। সোজা পা চালিয়ে চলো।

তবু সুধার জড়িপটি যায় না। একটু কেমন থমকে-থমকে দাঁড়ায়। পায়ের পাতার নিচে শব্দ হয় শুকনো পাতার।

আর শুধু এই মাঠটুকু পেরোনো। তার পরই কাঁচা রাস্তা। ঘেরাটোপে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আর, একবার গরুর গাড়িতে উঠতে পারলেই নিশ্চিন্ত। তুমি আর আমি।

কিন্তু মাঠটুকুই পেরোনো গেল না। ধরে ফেললে ওদেরকে।

আখড়ার ছোঁড়ারা কেউ কেউ খবর পেয়েছিল বুঝি।

আড়ে-ওড়ে থেকে বুঝতে পেরেছিল। বুঝতে পেরেছিস তো ভাল কথা। সাহায্য কর্, সুরাহা কর্, বাগড়া দিস কেন? কেন অকারণে পথের কাঁটা হোস?

বললেই হল? একটা আইবুড়ো মেয়েকে বোকা বুঝিয়ে গাঁয়ের বার করে নিবি, আর তাই আমরা মেনে নেব? আমরা কচি খোকা?

কালাচাঁদকে ধরে ফেলল সবাই। আচ্ছা করে ঠুকে দিলে। ডাকা করিয়ে মেয়েটাকে পৌঁছে দিলে মায়ের হেপাজতে।

মাঠের কাছেই ভগীরথ কুনাইর বাড়ি। কালাচাঁদকে তুলে আনল ভগীরথ।

মুখে জল দিল। পাখার বাতাস করল। একটু সুস্থ হলে ঘরুটে গরুর টাটকা দুধ দিল খেতে।

ভগীরথের স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে আজ বছর পনেরো। ঘরে আর লক্ষ্মীর পাঁজ পড়েনি। সংসারের করা-কম্মার জন্যে চাকর-বাকর আছে, পোষ্য-পাল্য আছে। বড় অবস্থার মানুষ। চাষের জমিই আছে শখানেক বিঘে।

'ইস্ত্রি নেই, ঘর-দোর খাঁ-খাঁ করে।' কেউ-কেউ হা-হুতাশ করে।

'যার ঘর-দোর সে চলে গেলে খাঁ-খাঁ করবে না?' মাথা ঝাঁকায় ভগীরথ।

'একজন যায় আরেকজন আসে। আরেকটা বিয়ে করো কেনে।'

'এই বুড়োকে মেয়ে দেবে কে শুনি? ষাট-বাষট্টি বয়স হল যে গো'— ভগীরথ আঙুলের মাথা ধরে ধরে কড় গোনে।

'যার বয়সে তার বয়েস! তোমার চামড়ায় এত কোঁচকায়নি কোথাও। সোস্থ-সমস্ত চেহারা। এস্‌রা করলেই কত মেয়ের টনক নড়বে।'

ভগীরথ হাসে। বলে, 'ভাত দিতে পারলে মেয়েমানুষের অভাব হয় না। তা জানি। কিন্তু মেয়েমানুষ হলেই তো চলে না, মনের মানুষ কই।'

এমনি করে টালবাহানা করেছে ভগীরথ। পাড়ায়-পাড়ায় মোড়লি করে বেড়িয়েছে। কার কি নালিশফরেদ তারই আস্কারা করেছে। আর যখন কখনো কিছুতে মন বসেনি একটা একতারা বাজিয়ে গান গেয়েছে।

আমীর লোক, বাড়িতে বসে খায়, কিছু বেমানান লাগে না। টাকার উপরে যে আছে সে গান গাইবে বৈ কি। উপর-পড়া হয়ে দু-চারটে সোহাগের বুলি বলতে তারই তো শোভা পায়। কিন্তু কিছু দিতে-থুতে বলো তো? হাড়-কৃপণ। মাছ সম্বুরবে তো তেল দেবে না। পিঁপড়ের গা টিপে গুড় বার করবে।

সম্বিৎ পেয়ে উঠে বসল কালাচাঁদ।

'কে ওই মেয়েটা ?' ভগীরথ যেন ঘনিয়ে বসল একটু।

চোখ নামাল কালাচাঁদ। ছোঁড়াদের কাছে মার খেয়েছে এখন আবার বুড়োর কাছে অপমান হোক।

গায়ে মিষ্টি করে হাত রাখল ভগীরথ। বললে, 'আমার কাছে লুকোসনে। আমার সঙ্গে সুহৃদ কর্।'

বহু কুনাইর বিটি ওটা। নাম সুধা।

কোন বহু ? সেই বহুবল্লভ কুনাই ? যার বউকে নিয়ে সমাজে এত গজল্লা ? এত ঘোঁট ? তার মেয়ে ? বলিস কি, এত বড়টি হয়েছে ?

লোকে দুর্নাম করে। তা ওরা বাপ-মারা বুঝবে। তাতে আমাদের কি ?

কালাচাঁদের গায়ে হাত রাখল ভগীরথ। চোখে হাসিমাখা স্নেহ নিয়ে শুধোল : 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলি মেয়েটাকে ?'

কালাচাঁদ চোখ নামাল 'কোথায় আবার !'

'বিয়ে করতিস মেয়েটাকে ?'

'নিশ্চয়। বিয়ে না করলে বাঁধতাম কি দিয়ে ? অন্য লোকে ছিনিয়ে নিত। যেমন এখন নিয়ে গেল বেমালুম। যদি বাঁধন দিতে পারতাম তা হলে এতক্ষণে থানা-পুলিশ হয়ে যেত— কোর্ট-আদালত করতাম।'

ঠিকই তো। এখনো ও তোর কেউ নয়। ওর উপর এখনো তোর কোনো দাবি দাওয়া হয়নি।

'কেউ নয়?' কেমন যেন ককিয়ে উঠলো কালাচাঁদ: "আমার দাবি দাওয়া নেই কিছুই?' বলেই ফের চোখ নামাল। যেন বাকি কথাটুকু শেষ করলে মনে মনে: 'ঠিকই তো। আমি কে? আমার আবার কী দাবি-দাওয়া!'

তক্তপোষ থেকে নেমে পড়ল কালাচাঁদ। কোমরের বাঁধনটা আঁট করতে করতে বললে: 'আমি এবার যাই।'

কোথায় যাবি?

'যে দিকে চোখ যায়। গাঁ-ঘরে আর ফিরব না। লজ্জার মুখ পাঁচজনকে দেখাব কি করে?'

লজ্জা— লজ্জা কেন?

মন যে পুড়ল তার জন্যে লজ্জা নয়, মুখ যে পুড়ল তার জন্যে লজ্জা। ভালোবাসলাম অথচ ভালবাসার জিনিসকে রাখতে পারলাম না কবজার মধ্যে।

তোরা কুনাই তো? ঘরাঘরি সম্বন্ধ হয়?

হয় বৈ কি। ভালই হয়।

তবে সোজাসুজি ছাঁদনাতলায় গেলেই তো পারিস। চুরি করে পালাবার কি হয়েছে?

এমনিতে বিয়ে দেবেনা বহু কুনাই। বহু নিমরাজি হলেও তার বউ একেবারে খাণ্ডার। আমার নামু অবস্থা— কিরষানি-মাহেন্দারি করে দিন গুজরাই। আমাকে সে এক কথায় ভেস্তা করে দিলে—

খুব তেজ আছে তো! খুঁতে হয়ে এত চোটপাট!

কিন্তু মেয়েটা যে সুন্দর।

তাতে সন্দেহ কি। বেশ সরল-দীঘল চেহারা। চলন-চাহন হেলন-দোলনটি বেশ।

ভগীরথ হঠাৎ আরো কাছে এল। আবার কাঁধের উপর হাত রাখল। কালাচাঁদকে বললে, 'সত্যি বিয়ে করতে চাস মেয়েটাকে?'

'তিন সত্যি।'

'তবে গাঁয়েই থেকে যা। কুথা যাবি বাউণ্ডুলে হয়ে?'

চোখে সরল ভরসা নিয়ে তাকিয়ে রইল কালাচাঁদ।

'থাক ধয্য ধরে। জানিস তো যে সয় তার হয়।' ভগীরথ স্বরে স্নেহ ঢাললে: 'কখন সন্ন-সুযোগ আসে কেউ বলতে পারে না। দাঁড় টানতে টানতেই পাড়ি জমে। যা ফিরে যা।'

চলেই যাচ্ছিল কালাচাঁদ, ভগীরথ আবার ডাকলে। যেন কি গভীর গোপন কথা জানতে চাইছে এমনিভাবে গলা নামাল। 'খুব ভালবাসিস মেয়েটাকে? না?'

'নইলে মুখ বুজে মার সহ্য করি?' গায়ে-হাতে এখনো মাটি লেগে আছে, তারই দিকে তাকিয়ে রইল কালাচাঁদ।

'কিন্তু মেয়েটা— মেয়েটা তোকে ভালবাসে?'

'নইলে বাপ-মা ঘর-বাড়ি ছেড়ে বিদেশে ভাসে কেউ?'

কিন্তু সব উলটো হয়ে গেল।

ভগীরথই প্রস্তাব করে পাঠাল বহু কুনাইর মেয়েকে সে বিয়ে করবে। ঘর-সংসার অরণ্য। ভরবয়সের ঘরণী-গৃহিণী না হলে সব অচল, সব অসার। মেয়েটিকে মনে ধরেছে ভগীরথের। বেশ দশাসই মেয়ে।

খবরটা পেয়ে উথলে উঠল মাতঙ্গ, বহু কুনাইর পরিবার। কিন্তু বহুর যেন দেহে তত সান নেই। ফুর্তি নেই মনে।

'কেনে ক্ষেতি কি হচে ? মনের কথা খুলে বলো কেনে ? কানে মদ গলে না, কেমন ? আর আমার মনের মধ্যে সমুদ্রের অগুন্তি ঢেউ।'

'কি বলছ বলো, শুনেই যাই।' বহু যেন ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কথা কইছে : 'এ একটা তামাসার কথা লয়, বিয়ের কথা। অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করতে হবে।'

'আর চিন্তায় কাজ নাই। চিন্তা করে কত রাজপুত্তুর ধরে হাজির করবে তা জানা আছে। শেষকালে এসে ধরলে কিনা ঐ বাঁশচাপা কালাচাঁদ। চাল নেই চুলো নেই— পথের কুকুর একটা। কানের পাশ দিয়ে তীর চলে গেছে— নইলে, আর একটু হলে—'

'থামো। আর একটু ভাবি—'

'ভেবে আমার ছেরাদ্দ হবে। গেঁতোমি তোমার গেল

না। এমন নেস্তি বেটাছেলে তো কোথাও দেখিনি।' গায়ে ঠেলা মারল মাতঙ্গ: 'কি তোমার মনের কথাটা খুলে বলো দেখিন। বলো, দেরি কোরোনা—' বলে পরের পর আরো কতগুলো ঠেলা মারল।

'লোকটা যে বুড়ো।'

'তাতে দোষ কি? তুমি লবকাত্তিক পাবে কুথা শুনি? মেলাই সম্পত্তি, তা দেখেছ? বাড়িতে কুয়ো, পায়খানা— বাড়ি থেকে মেয়েকে কোথাও যেতে হবে না বাইরে। রাজরাণীর মত থাকবে। যা বলবে তাই বুড়ো ঘাড় কাৎ করে করবে। বিটির দৌলতে আমাদেরও বরাত ফিরবে। ছেলেগুলো খেয়ে-পরে মানুষ হবে। নিন্দে? নিন্দের কথা থোও। নিন্দের আর বাকি কি? সারা জেবন ধরেই তো নিন্দের বিন্দেবন চলল। নিন্দে করে লোকে তো আমার সব করবে। খেতে না পেলে কত সবাই ডেকে শোধায়!'

'আহা, তুমি বড় বেশি বকো। বলি, সব মুখের কথা, না দলিল-পত্তর রেজেষ্ট্রি করে দেবে?'

ঠিক কথা। দামি কথা। সব পাকাপাকি হয়ে যাওয়া ভাল। যেন কোনো ফাঁক-ফাঁকি না থাকে।

'হ্যাঁ তাই। তোমার ভাইকে ডাকো— সুধার মামাকে। জগতে তিন মামা আছে— কংস, শকুনি আর তোমার ভাই শম্ভু কুনাই। তাকে ডেকে সল্লা করো কেনে—'

মাতঙ্গ রাগ করল না। ভাইকে খবর পাঠাল।

ভগীরথ বললে, 'তোমরা যা চাইবে আমি তাই দেব, কেবল আকাশের চাঁদ দিতে পারব না। বুড়ো বলে আমায় হেনস্তা করে লাভ নেই। আমার শরীর দড় আছে, কল-কব্জাও ভালো আছে। মনের জোরও যথেষ্ট। বলো, কি চাই ?'

শম্ভু হাত কচলাতে লাগল। বললে, 'আমরা কি বুলতে কি বুলব তার ঠিক আছে ? আপনিই বলুন।'

'দেখ, বেশি কথার মানুষ নই আমি। সোজাসুজি বুলছি। দশ বিঘে ধানী জমি কন্যার নামে লিখে দেব বিয়ের রাত্তিরে— আর বিয়ের পর রেজেষ্ট্রি। আর খরচা বাবদ দুশো টাকা নগদ। নাপিত-পুরোত সব আমার। লোক-দেখানো দান-সামগ্রীর টাকাও ধরে দেবখন। কি, হল ? রাজি ?'

শম্ভু ঠোঁট চাটল। বললে, 'কিন্তু গয়না-পত্র ?'

'সে তোমাদেব ভাবতে হবে না। আমার জিনিস আমি সাজাব। কাণাকে কাণী মেলে, ভূতকে মেলে ভূতনী, কিন্তু রাজাকে রাণী মিলবে দেখো। রাণীর মত সাজাব! তারপরে বাবুগিরির যত জিনিস আছে— স্যাণ্ডেল চশমা রুমাল হাত-ঘড়ি—সব দেব সেই রাজকন্যেকে।'

হাড়েটক শয়তান, শম্ভু বললে, 'বেশ, আগে নগদ টাকাটা দিন—'

তড়িঘড়ি টাকা দিয়ে দিলে ভগীরথ। কেউ এতটা ভাবে নি। ভেবেছিল টালমাটাল করবে বুড়ো। কষাকষি করবে। কিন্তু না, একটা রসিদ পর্যন্ত চাইল না।

'গয়না কিনতে কবে যেছেন বলুন। দিন স্থির করুন।' শম্ভু আবার চাপ দিল।

ভগীরথ দিন-ক্ষণ বলে দিল। বললে, 'গয়নার মাপ নিয়ে আসবেন— আংটি, চুড়ি, উপর-হাতে সেই যে কি বলে গো তাই— আর কোমরের বিছে না চন্দ্রহার ?'

'কথার যেন ঘোরফের না হয় মোড়লমশাই।' শম্ভু আবার চাপ দিল : 'তাহলে কিন্তু বেঁকে দাঁড়াব আমরা—'

ভগীরথ হাসল। বললে, 'আমার দিক থেকে ভয় নেই। আপনাদের তরফে ঘোরফের হলেই মুস্কিল। শেষকালে না খেসারতের দায়ী হন।'

এসব কি অলুক্ষণে কথা! ভালো লাগল না বহুবল্লভের। একমুষ্টে এতগুলো টাকা যে দিল তাঁর সঙ্গে আবার প্যাঁচ কিসের!

বহুবল্লভ ঠাণ্ডা সুরে বললে, 'কন্যে একবার দেখবেন না ?'

জানাশোনা ঘরের মেয়ে, এর আবার দেখাদেখি কি! এই নাও পাঁচটা টাকা, মেয়েকে দিয়ে দিও মুখদেখানি। বুড়ো বরের দিকে যেন সুনজরে দেখে। ফোকলা দাঁতে হাসল একটু ভগীরথ।

বৈশাখী শুক্লাষ্টমী। বারোয়ারিতলায় যাত্রাগান হবে।

এই চলে গেল মনমোহিনী খিলি। এই চলে গেল ঘুঘুডাঙার পান। এই চলে গেল—

পান বেচছে কালাচাঁদ।

মন্দিরের একপাশে দাঁড়িয়ে দেখছে তাই সুধা। মন্দিরে সান্ধ্য আরতির বাদ্যভাণ্ড বাজছে। প্রতিমার দিকে না তাকিয়ে সুধা কিনা বিভোর হয়ে দেখছে কালাচাঁদকে। হাওয়াতে চুল উড়ে-উড়ে এসে পড়ছে কপালে, বাঁ হাত দিয়ে সরিয়ে-সরিয়ে দিচ্ছে। তবু চোখে নিমিষ নেই।

এই দিকে একবারও তাকালনা কালাচাঁদ। মার খেয়ে চরম শিক্ষা হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়। হ্যাঁ, না তাকানোই ভালো। দুদিন বাদে পরের ঘরের বউ হয়ে চলে যাচ্ছে সুধা। কালাচাঁদের চেয়ে সে ঢের বেশি জোরালো। ঢের বেশি পয়মন্ত। বয়স একটু বেশি হয়েছে বটে, তা, অবস্থাও বেশি। পায়ের উপর পা ঝুলিয়ে থাকব। চাকর-বাকরে খাটবে-পিটবে। কত শাড়ি কত গয়না! জমি দেবে লিখে পড়ে। নগদ টাকা দেবে বাক্স ভরে। সম্পত্তি পেলে যমযন্ত্রনাও সহ্য হয়। বেধবাকে বেধবা মনে হয় না।

কালাচাঁদ হলে তাকে কী দিত? ছেঁড়া ট্যানা, আধ-পেটা ভাত আর পায়ে-হাঁটা রাস্তা।

আহা, কি বা রূপের ছিরি, শিঙের মত করে টেড়ি বাগিয়েছে। চোয়াড়ে গাল দুটোতে গর্ত ফুটিয়ে বিড়ি টানছে দেখ! কালো কিটকিটে চেহারা, ধান-সিজে হাঁড়ির মত, তা, পান খেয়ে টিকেয় আগুন ধরিয়েছে মাইরি। খদ্দের আর কোথায় মিলবে? নিজেই সব খেয়ে-খুয়ে সাবাড় করে থোও না। কটা বিড়ি ফুঁকলে এ পর্যন্ত? চিবুলে কটা পান?

'বাড়ি যাবি না?' ও-পাড়ার পারুল এসে গায়ে ধাক্কা মারল: 'যাত্রা শুনবি? চল খেয়ে আসি। গান জুড়তে দেরি আছে।'

সুধার চমক ভাঙল। বললে, 'খেয়ে এসেছি। গান শুনব তারপর বাড়ি যাব। মা এসেছে, পাড়ার মাসি-পিসিরা এসেছে। আমার কি আর একলা হবার জো আছে ভাই? চোখে চোখে পাহারাদার। যা, তুই ধাঁ করে আয় গা। আমরা এক জায়গায় বসব।'

'তুই এ জায়গায় থাকিস। আমি এলাম বলে।'

সুধা আবার তাকাল সেই চেনা জায়গায়। কালাচাঁদ নেই। দোকান আছে, দোকানি উধাও।

বুকের মধ্যে শিরশির করে উঠলো সুধার। গা-ঢাকা দিয়ে কাছাকাছি কোথাও আছে নাকি ঘাপটি মেরে? আবার কোনো ইসারা করে বলবে নাকি বেরিয়ে আসতে? এবার হয়তো বন্দোবস্ত অনেক ভালো হয়েছে, এবার আর

ধরা পড়বে না। আটঘাঁট বাঁধা হয়েছে ভালো মত। এবার হয়তো সটান পালকি, কিংবা কে জানে, হাওয়াগাড়ি! গাঁয়ের রাস্তায় কখনো-সখনো হাওয়াগাড়িও তো আসে দেখেছি।

না বাবা, আর আরামে কাজ নেই। যা না রূপ, যা না অবস্থা, হাওয়াগাড়ি চড়বে! তার চেয়ে এই ভালো। অনেক ভালো। শুধু আমি সুখে থাকব না, আমার বাপ-মা ভাই-বোন সকলেই সুখে থাকবে। ধান আসবে, টাকা আসবে, ঘরের চাল-দেয়াল ছাঁদন-বাঁধন হবে। সেটা কি কম শান্তি? তার উপরে চমক-দেয়া শাড়ি আর ঝিলিক মারা গয়না—

একটি মজার দৃশ্য হচ্ছে যাত্রা গানে। নাচ-গানের দৃশ্য। এক বুড়ো ব্রাহ্মণকে নিয়ে কতগুলো ছুঁড়ি রং-তামাসা করছে। ঘুরে ঘুরে গাইছে আর নাচছেও ঘুরে ঘুরে।

"ও আমাদের বুড়ো বর
তোমায় নিয়ে আমরা সবে
মনের সুখে করবো ঘর।"

যতই গান হচ্ছে ততই বুড়ো খেপে যাচ্ছে। হাত-পা ছুঁড়ছে।

পারুল সুধার গাল টিপে দিল। বললে, 'শোন্‌লো ভালো

করে শোন্— বুড়ো বরের নাকাল ছ্যাখ্। তোর কপালেও বুঝি—'

'ভাই হবে ?' সুধা পারুলের গায়ে চিমটি কাটল : 'তোর হবে।'

হ্যাঁ লো, সুভদ্রা কে ? ওমা তাও জানিস না ? চিকেষ্টর ভগ্নি। ওগো, পালা কি ? শাপমুক্তি। রুক্মিণীহরণ দিলে না কেন ? শোনো, শোনো, দণ্ডী রাজাকে জগতের কেউ জায়গা দিলে না। সুভদ্রা চিকেষ্টর ভগ্নি হয়ে জায়গা দিলে। বাহবা মেয়ে, অমন ভাইর বিরুদ্ধেও দাঁড়ালে উঁচু মাথায়। দাঁড়াবে না ? আশ্রিতপালন যে মহাধর্ম। যে যার শরণ নেয় তাকে মারা উচিত নয় কখনো। আশ্রয় নিতে হয় তো মহৎ লোকেরই নিতে হয়। কর্তব্যং মহদাশ্রয়ঃ।

মাতঙ্গ মেয়েকে বুঝিয়ে দিল ভালো করে। 'শুনলি, বুঝলি কিছু ? মহৎ লোকের আশ্রয় নিতে হয়। মহৎ মানে বড়লোক— বুঝলি ?'

বলেই পাশের বুড়িকে জিগগেস করলে : 'ঠানদি, মহৎ মানে বড়লোক নয় ?'

ঠানদি বললে, 'তবে কি তোর চাষাভুষো, ছোটলোক ?'

নিশ্চয় ! সুধা বললে মনে মনে : বিপদে যে রক্ষা করে সেই তো মহৎ। পথ থেকে যে ঘরে তুলে নেয়, লোক সে বড় নয় তো কি।

কিন্তু কালাচাঁদ গেল ভগীরথের বড় জামাই ত্রৈলোক্যকে খবর দিতে।

মন্দ কথা বাতাসের ভর সয় না, ত্রৈলোক্য আগেই খবর পেয়েছে। টাকা-পয়সা যেখানে, ঝগড়া-বিবাদ সেখানে। এ না জানে কে!

'তোমরা এতগুলো চ্যাংড়া জোয়ান আছ গাঁয়ের মধ্যে—তোমাদের চোখের উপর এ ব্যাপার ঘটে কি করে?'

'তাই তো আপনাকে খবর করতে এসেছি। আমাদের টাকার জোগাড় কই?'

এ কোনো মতেই হতে পারে না। অসম্ভব। দুই মেয়ের ছেলেপিলে আছে, মেয়েরা চোখের সামনে আছে। তাদিকে বঞ্চিত করে দশের মতের বিরুদ্ধে দেশময় কলঙ্ক রটিয়ে একটা কচি মেয়ের সর্বনাশ হতে দেব না। আমরা থাকতে এত বড় একটা বিষয় হস্তান্তর হতে দেব না। দেখি কার সাহস। দেখি কি করে জিদ বহাল রাখে! দেখি কি করে বিয়ে করে। তুমি কৌশল জানো, আমরা জানিনে? তোমাকে জব্দ করতে অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠিত হব না। ভীমরতি ধরেছে! পাঁজি কাঁহাকার। গোল্লায় যেতে বসেছ!

'কি হল হে মাস্টারবাবু? চীৎকার কেনে? সকাল বেলায় মাথা গরম কেনে?'

'দেখ তো ভাই, আমার শ্বশুর মিন্সের আক্কেল দেখ তো! আমাকে বঞ্চিত করে ছোট জামাইকে বঞ্চিত করে নাতিদের সব ফাঁকি দিয়ে মেয়েদিকে কাঁদিয়ে ব্যাটা বিয়ে করবে! বিষয়টাকে ছারখার করবে। ব্যাটার মাথা বিগড়ে গিয়েছে—'

'বলো কি হে! ধরে উত্তম মধ্যম দিয়ে দাও কেনে—'

'না হে, কথাটা তলিয়ে বোঝো। আচ্ছা আমার ছেলেপিলেই না হয় মন্দ হল, ছোট মেয়ে কি দোষ করলে? তারাও যদি দুখী হল, ভাইপো-ভাগ্নেরা কি দোষ করলে? ব্যাটা ভারি ওস্তাদ হয়েছে! বিয়ে-পাগলা না মাথা-পাগলা হয়েছে! তার চেয়ে একটি রাখনি রাখ কেনে! যত পাজির পা-ঝাড়া। শোনো, তোমাদিকে আমি টাকা দিচ্ছি, জোন কতক একটু লাগো তো উঠে পড়ে। ব্যাটাকে একটু ঠুকে দি আচ্ছা করে। ইস্কুল ছুটি নিচ্ছি ক'দিন। কাছিমের কামড়, ছাড়বনা কিছুতে—'

কালাচাঁদ ফুলে উঠল ভিতরে-ভিতরে। বললে, 'কংগ্রেসে চলুন কেনে।'

ঠিক বলেছ। চলো, কংগ্রেসকে খবর দিই। সব ঢিট করে দেবে।

কংগ্রেস বলতে মধুবাবু। কবে কোন ভুলে যাওয়া দিনে একবার কি জেল খেটেছিল সেই সুবাদে সেই এখানকার কংগ্রেস। মান্যশ্রেষ্ঠ।

ছোঁড়া-বুড়োর একটা ভিড় জমে উঠল মধুবাবুর দোরগোড়ায়।

ব্যাপার কি? ফ্যাসাদ কি?

সব শুনলেন মধুবাবু। বুঝলেন লোকেরা কি চায়, সেই বুঝে রক্ত গরম করে ফেললেন।

বললেন, 'বিয়ে কবে?'

'কাল।'

'এ বিয়ে হতে পারবে না। না, কিছুতে না। এ বিয়ে ভণ্ডুল করতে হবে।' রায় দিলেন মধুবাবু।

জনতা উল্লসিত হয়ে উঠল। মারো মারো শালাকে। শালার ছুঁচিমুখ ভুঁতি করে দাও। বুড়ো গাধার ঠ্যাং ভাঙো। ভালুক নাচ নাচাও। কান কেটে দাও জায়জাতার। খাল খুলে নাও। চামড়ায় ডুগডুগি বাজাও। ঘেসো ভুঁড়ি ফেঁসে দাও ছুরি দিয়ে।

মধুবাবু নিরস্ত করলেন মারমুখোদের। বললেন, 'বিয়ে শুধু ভেঙে দিলেই চলবে না। ঐ সভাতেই মেয়েকে পাত্রস্থ করতে হবে। তার সন্ধান রাখো?'

পাত্রের অভাব কি! কেনে, আমাদের কালাচাঁদ কই? আমাদের কালাচাঁদই তো আছে।

কে কালাচাঁদ?

সবাই হৈ হৈ করে উঠল। যারা একদিন জোট বেঁধে

মেরেছিল কালাচাঁদকে, তারাই কালাচাঁদকে এগিয়ে দিলে।

তাদের মার দেওয়া নিয়ে কথা। তারা অন্যত্র মারের ঘ্রাণ পেয়েছে। আর, এটা বেশ একটা ঢালাও মার।

মধুবাবু তাকালেন কালাচাঁদের মুখের দিকে। কি রে.. রাজি ?

কালাচাঁদ দেশভক্ত বাধ্য ছেলের মত বললে, 'যদি আপনারা সবাই বলেন—'

এদিকে অন্য দিক আছে। আছে শকুনি মামা। আছে তাদেরও দল-দঙ্গল।

'হোক না গাঁয়ের লোক বিরোধী, আমাদেরও দলবল আছে। কুছ পরোয়া নেই। গোড়া এঁটে এসেছি আমি। তোমরা সব ঠিক থাকো। বিয়ে দিতেই হবে। যখন গয়না-গাটি কাপড়চোপড় কেনা হয়ে গেছে তখন আর পেছু হাঁটলে চলবে না। আগুন-ঝাঁপা হয়ে পড়তে হবে। আমাদের নিজের ছেলে যদি জলে ভাসিয়ে দিই তাতে লোকের কি ? ওহে বুনুই, তুমি ভেবো না। যখন আসরে নেমেছি তখন কার্য উদ্ধার করবই করব। কোন শালা কি করবে ? এ কি মগের মুলুক পেয়েছে ? কংগ্রেস আছে, কোর্ট-পুলিশ নেই ? দেখা যাক মহামায়ার খেলা। যে সব কথা আগে হয়ে আছে তা যেন মনে থাকে। আমার দেখা এখন পাবে না, ঠিক সময়ে পাবে। হ্যাঁ দেখ, ঐ বুড়ো বামুনটির কথামত চলো।

ওকে ছাড়লে চলবে না। ও হচে বুড়ো ঘাগু, এসব কাজে এসপাট। ওকে কিছু পেনামি দিতে হবে বেশি করে। সে আমি দেখব— কিচ্ছু ভেবো না। কোদাল-কাটা ঘাসের মত শুকিয়ে থেকো না। কাজ করে যাও। বল বাঁধো। দল পাকাও। কুচ পরোয়া নেই।'

এখন কথা উঠেছে বরের পার্টিকে কোথায় মারবে? কোথায় আটকাবে? রাস্তার মধ্যেই? না, আসরে এসে বসলে?

একদল বলছে, গাঁয়েই ঢুকতে দেব না। বর নাকি মোটরে চড়ে আসবে, ওর গাড়ির চাকা ফুটো করে দেব। মোটর থেকে নামিয়ে ঘোড়দৌড় করাব। ওঠ-বোস করাব। ঘোল ঢালব। মাথা মুড়িয়ে দেব। বাকি দাঁত কটা—

আরেক দল বলছে, রোখ করে শুধু ঠেকালেই চলবে না, ব্যাটাকে শিক্ষা দিতে হবে। গ্রামস্থ সকলের সামনে অপমান করে নাকে-খৎ দিইয়ে দুয়ো-দুয়ো করে তাড়িয়ে দিতে হবে। ওর চোখের উপরে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে কালাচাঁদের সঙ্গে—

মধুবাবুকে ডাকো। তিনি ফয়সালা করুন।

না, না, আসরে এসে বসুক। নইলে পালা জমবে কেন? আগে পোষ মানুক। আস্তে আস্তে পিঁজরে গিয়ে ঢুকুক, রাধাকেষ্ট বুলি ধরুক। তার পরেতে তো আকাশে উড়োব!

তাই ভালো, তাই ভালো। আগে আসুক, বসুক, প্রাণে ঢেউ তুলুক! খবরদার, রাস্তায় ভিড় করে কেউ যেন বুঝতে দিও না আগে ভাগে। বুড়ো বরের বিয়ে, যেন কত ফুর্তি, এমনি সব ভাব করো কেনে। আহ্লাদে আটখানা ছেড়ে আঠারোখানা হও। স্বগ্রাম-ভেন্নগ্রাম, স্বজাতি-বেজাতি সব ঠাঁই-ঠাঁই হয়ে থাকো, থাকো দূরে-দূরে।

মটকার পাঞ্জাবির উপর জরির চাদর জড়িয়ে ভগীরথ মোটরে উঠল। দলবল আমারো আছে হে। আমিও খাজা কাঁঠাল— সহজে ছাড়ব না। বেশি কিছু চোটপাট করে, ফৌজদারি করব। আদালত তো পরে খোলাই আছে। টাকা নিয়েছে, গয়না নিয়েছে, জমি-বিক্রির লেখাপড়া হয়ে গেছে। এখন চাঁদরা যাবে কোথায়? আমারও সঙ্গে লেঠেল আছে। থানায় খবর দিয়ে রেখেছি আগে থেকে। খবরের সঙ্গে-সঙ্গে খাবারও দিয়েছি খুশিমত। হয়ে যাক একটা নয়-ছয়। মরব তো লড়াই করে মরব। না মরে ভূত হব কেনে? ওঠ্ ওঠ্ তোদের গাড়িতে। ও সর্দারের পো, তোমরা দলে দলে বেরিয়ে পড় আগে-ভাগে। যখনই হুকুম করব, তখনই— বুঝলে?

রাস্তায় কোনোই বিপদ হল না।

হবে কোন সাহসে? থানা-পুলিশ আমাদের দিকে। দেহে তাগদ নেই, গুমর খুব। আয় না, লাগ না এসে—

ভগীরথ সভাস্থ হল। মেয়ের দল উলু দিয়ে উঠল কলকল করে।

সঙ্গে সঙ্গে ভীম-ভৈরব কাণ্ড— তেড়ে এল সব ছেলের দল। দাঁত-ভাঙা চুল-পাকা মাজা-বাঁকা বুড়োর সঙ্গে একটা কচি মেয়ের বিয়ে হতে পারবে না। দে সব ভণ্ডুল করে, দক্ষযজ্ঞ বাধা। এ বুড়ো তো ডাকাত, ফাঁস্তুড়ে। একটা অবলা মেয়ের সর্ব্বনাশ করতে এসেছে! বব্ভুলে বোম্বেটেকে বার করে দে গাঁ থেকে। মোটরে এসেছ এবার উল্টো গাধায় ফিরে যাও। ঘাড়ে শয়তান এসে সোয়ার হয়েছে তোমার! যদি এমনিতে না নামে, তবে লাঠির ঘায়ে নামবে। কই হে লেঠেলরা— আলো বাঁচিয়ে—

শকুনি-মামা ভগীরথের কানের কাছে এসে বললে, 'হুকুম করুন।'

ভগীরথ বললে, 'পাগল! বিয়ে বাড়িতে শেষে দাঙ্গা বাধাবো নাকি? আমার লোকদের বলো সব সরে যেতে। মারামারি করে লাভ নাই।'

লাভ নাই তো উঠে পড়। ঘোল খাও। ঢোল বাজাও।

আপনাদের বক্তব্যটা কি? ভগীরথ উঠে দাঁড়িয়ে জনতাকে সম্বোধন করলে। কি চান আপনারা? কি করতে বলেন আমাকে? আপনাদের মধ্যে মাথা কে?

আমরা সবাই মাথা। আমাদের সবারই একটা করে

মাথা। কিন্তু বুড়ো বরের ঘাড়ে দুটো মাথা। সেই দুটোকেই এক বাড়িতে সাবাড় করব।

মধুবাবু উত্তেজনা শান্ত করলেন। এগিয়ে এলেন ভিড় ঠেলে। বললেন, 'কথার মানুষ আমি। আমি বলছি আপনার এখানে বিয়ে করা চলবে না। ষাট-সত্তর বছরের বুড়ো হয়ে একটা নিরীহ অসহায় গ্রাম্য বালিকার সর্বনাশ করতে চান ? যান, ফিরে যান বলছি। আমরা দশের জোরে, গায়ের জোরে এ বিয়ে ঠেকাব।'

প্রাণপণ চীৎকার করতে করতে বাইরে বেরিয়ে এল মাতঙ্গ। আমাদের মেয়ে যাকে খুশি তাকে দেব, তাতে তোমাদের কি ? হাটে বিচে দেব, নদীতে ভাসিয়ে দেব, আমাদের ইচ্ছে। তোমাদের কি মাথাব্যথা ? টাকার লোভে দু-চক্ষু অন্ধকে বিয়ে দিচ্ছি না, বুড়ো বরে বিয়ে দিয়ে বাচ্চা তুলে নিচ্ছি না, এ আশি বছরের ঘাটের মড়া লয়। কেন বিয়ে হবে না ? আজ আমার বেলায় আইন হল ! গরিব পেয়েছ বলে ? লাঠি ধরবার লোক নেই বলে ?

অনেক কষ্টে মাতঙ্গকে থামানো হল। ভগীরথ বললে, 'আমি তো চলে যাব। কিন্তু পাত্রীর উপায় হবে কি ? লগ্ন ভস্ম হবে না ?'

'সে ভাবনা ভাবতে হবে না আপনাকে। আমাদের পাত্র ঠিক আছে।'

মিলে যাচ্ছে হুবহু। সবাইর সঙ্গে-সঙ্গে ভগীরথও তাকালো কালাচাঁদের দিকে। চোখোচোখি হতে হাসল কালাচাঁদ।

'ঠিকই যখন আছে, তখন গোড়াগুড়ি থেকে ঠিক রাখলেই হত।' ভগীরথ টিটকিরি দিয়ে উঠল: 'মাঝখানে এই কোরকাপের দরকার কি ছিল? শাড়ি-গয়না, জমি-জায়গা— এ সব প্রবঞ্চনা কেন?'

চট করে কথা এল না মধুবাবুর। ভিড়ের থেকে কে একজন বাঁচাল তাকে। বললে, 'এ তোমার পাপের গুনাগার।'

'বেশ, তবে তাই। তাই যাক্ আমার লোকসানি। পিঁড়ি থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি। সরে দাঁড়িয়ে পুণ্যকর্মটা দেখি তোমাদের। বিয়ে করাটাই বারণ। বিয়ে দেখতে তো আর আপত্তি নেই। কই, ডাকো কালাচাঁদকে। কই হে কালাচাঁদ?'

আশ্চর্য, বুড়োর এতটুকু রাগরোষ নেই? এত বড় আশাভঙ্গেও এতটুকুও বুদ্ধিভ্রংশ হলনা? হাতের মুঠোয় এসে হাতের শিকার পালিয়ে গেলেও হাত কামড়াল না একটুও? উলটে বলছে কিনা কই হে কালাচাঁদ!

কে— কার কথা বললে? কে পাত্র? কি নাম? মাতঙ্গ ফের বেরিয়ে এল।

'আছে গো, ঠিক আছে। ভালো পাত্র। মনোমত পাত্র। ঠিক পাল্টা ঘর।'

'কই?' দু কোমরে হাত রেখে মাতঙ্গ ঝুঁকে দাঁড়াল সামনের দিকে।

'আলচে। ভয় নাই। তোমার কনে দু-ছান্নে হতে দেব না। নগ্নভস্ম হবে না কিছুতেই।'

এই—এই কেলে হারামজাদা আমার জামাই হবে? তার চেয়ে মেয়ে আমি কেটে ফেলব দুটুকরো করে। ওগো, ও জায়জাতা আমার মেয়েকে চুরি করতে এসেছিল, লষ্ট করতে এসেছিল। ওর সঙ্গে বিয়ে হলে বঁটি দিয়ে গলা কাটব। মেয়ের কাটব, নিজের কাটব, যাকে নিজের কাছে পাই তাকে কাটব।

সঙ্গে-সঙ্গে শোকের তরঙ্গ: ওগো, আমার কি সর্বনাশ হল গো! গাঁয়ের এই গুখেকোর বেটারা আমার বিয়ে ভাঙিয়ে দেল গো! তাদের মাগরা শাখা ভেঙে কবে পথে বেরুবে গো! কবে তাদের নির্বংশ হবে গো—

বহুবল্লভেরও সেই মত। আর যার সঙ্গেই হোক কালাচাঁদের সঙ্গে নয়।

ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। পাগলের মত করতে লাগল মাতঙ্গ! যে দিক দুচোখ যায় সেই দিকে যাব। এমন অবিচারী গাঁয়ে থাকব না। মা-বাপ বসে থাকল, শাস্তোর-

জ্ঞানীরা মেয়ের বিয়ে ঠিক করলে ! অমন ভদ্দর নোকের মুখে আগুন। না, ছেড়ে দাও আমাকে, আমি জলে ডুবব। না হয়তো লাঠি ধরো, পাতটাঙ্গি ধরো, অন্তত দুই নামুনের মাথা কাটো। জেলে যাব, দ্বীপান্তরে যাব—

'চেঁচাও কেনে?' বহুবল্লভ ঝাঁজিয়ে উঠল: 'যা হোক ব্যবস্থা একটা হচে—'

চুপ করো হে লেঠেল, তুমি চুপ করো। মাতঙ্গ আবার তরঙ্গ তুলল। তুমি খুব বীর। খুব মজা দেখছ। আমার দুয়োরে এলে ঝাঁটা মারব। যদি এক বাপের ছেলে হবি আমার তি-সীমেনায় পা দিবিনে। সব এক লায়ের সারি। সব উব্‌কারী বন্ধু !

ভগীরথ প্রমাদ গুনল। গণনায় এমনটি তো কই ছিলনা ! এখন উপায় ?

উপায় ভগীরথের সঙ্গেই বিয়ে দেওয়া। শকুনি-মামারা পরামর্শ দিলে। মানতের পর দেবতা বদলানো চলে না।

কখনো না। মধুবাবু আবার বেসুর ধরলেন। কালা-চাঁদকে পছন্দ না হয় অন্য সৎপাত্র ধরে আনছি। কিন্তু বুড়োর সঙ্গে কিছুতে নয়। ধমনীতে রক্ত থাকতে নয়।

কিন্তু এ-গাঁ ও-গাঁ কোনো গাঁয়ের ছেলেই এগিয়ে এলনা। মেয়েটা খুঁতে। মেয়েটা দুষে গিয়েছে। এমনি একটা নিন্দে আছে হাওয়াতে। তাই সবাইর দুনু-মুনু।

'আর তোদের মা-মাসি-বুন-বিটিরা সব সতী— নারে আবাগেরা ?' মাতঙ্গ আবার মার-মার করে এলো।

না। পাত্র পাওয়া গিয়েছে। খুব সরেস পাত্র।

তিলডাঙ্গার যদু কুনাইর ছেলে সুধীর কুনাই। ঐ যে শাপমুক্তিতে অভিমন্যু সেজেছিল গো। সেই যে সুন্দর চেহারার ছোকরা, সেই যে গান গেয়েছিল— দেখনি ?

অবস্থা ভালো, খাওয়া-পরার চিন্তা নেই। যাত্রাদলে পাকা চাকরি, পান-বিড়ি ফিরি করার চেয়ে অনেক ভালো।

দেনা-পাওনার ধার ধারতে হবে না। নিজের থেকে এগিয়ে এসেছে দায় উদ্ধার করতে।

এমন পাত্র হলে মাতঙ্গর আপত্তি নেই। এমন পাত্র হলে বহুবল্লভ তো ঘাড়-কাৎ।

কিন্তু শস্যঞ্চ গৃহমাগতং। সুধীর কই ?

আসছে, আসছে— এই এসে পড়ল বলে। ভাবনা নেই। লগ্ন আজ সমস্ত রাত। মধুবাবু যখন আছেন তখন ব্যাপার-ব্যবস্থা হবেই।

সুধা সব শুনতে পাচ্ছে ঘরের ভিতর থেকে। যত না নিজে শুনছে, সঙ্গিনীরা রঙ্গ করে টিপ্পনি কাটছে। একেকবার মাথায় বজ্রের ঘা পড়ছে, আবার সম্বিৎ ফিরে পাচ্ছে। সে যেন বাসা-ছাড়া উড়োন পাখি। একবার এ-ডালে উড়ে বসছে, আরেকবার ও-ডালে। একবার এ-বন মনে করছে,

আরেকবার ও-বন। বুড়োর সঙ্গে বিয়ে হবে না— না হোক, তার কালাচাঁদ আছে। শত হলেও পুরোনো দিনের চেনা-শোনা— পঞ্চজনের সাক্ষাতে তারই হাতে তুলে দাও কেনে। বেশ, কালাচাঁদে আপত্তি— তবে বুড়োর হাতেই সঁপে দাও চুপচাপ। অন্তত সুখে-স্বচ্ছন্দে তো থাকতে পারবে। ভাতের কষ্ট তো আর থাকবে না। পেট ভরলেই বুক ভরে। পেট ফাঁকি হলেই জগৎ ফাঁকি। তা'ছাড়া সর্ত করেছ, টাকা-পয়সা নিয়েছ, গায়ে গয়না উঠেছে, তাকে বঞ্চিত করা কি অধর্ম হবে না? বেশ, বুড়ো বলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়, গা থেকে সুধা খুলে ফেলছে গয়না, খুলে ফেলছে শাড়ি— তেমনি এক কাপড়ে ছেঁড়া ত্যানা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে কালাচাঁদের সঙ্গে। যা হয় একটা হেস্ত-নেস্ত করো। এ-ডাল ও-ডাল আর উড়তে পারে না সুধা।

কিন্তু হঠাৎ এ কী খবর!

সুধীর? সেই যাত্রাগানের অভিমন্যু? সাজসজ্জা করা সেই রাজপুত্রের মতো যাকে দেখতে? যাকে একবার দেখলে বারে বারে দেখতে ইচ্ছে করে? যে একেবারে নতুন? যে একেবারে আনকোরা? টাটকা, তরতাজা? যার মধ্যে এতটুকু দাগ, এতটুকু আঁচড় নাই? সেই নতুন বৃষ্টির জলের মত যে মিষ্টি?

কিন্তু কোথায় সুধীর?

আহা, ব্যস্ত কিসের ? এসেছিল লড়াই দেখতে, এখন দেখছে নিজেরই দিগ্বিজয়। গিয়েছে দাদার কাছ থেকে একটা মৌখিক মত আনতে। মধুবাবু যখন আছেন তখন কিছু বেগ পেতে হবে না। একটু রোসো কেনে।

ভগীরথের আশা ছিল সুধীর শেষ পর্যন্ত আসবে না। এক পা দু'পা করে চম্পট দেবে। কিন্তু না, সত্যি-সত্যি এসে পড়ল। নতুন কাপড় পরে গায়ে নতুন শার্ট চাপিয়ে সত্যি-সত্যি হাজির। শস্থু একেবারে গৃহদ্বারে।

এইবার একটি হুলুস্থুল বাধিয়ে দাও। ধুয়ো তোলো। দাও আমার টাকা ফেরৎ। দাও আমার গয়না-শাড়ি। ট্রাঙ্ক-বাক্স। বরের বদলে বর আছে, কন্যের বদলে আমাকে কন্যে দাও। লাগাও গোলমাল। ওরা ধুলো উড়িয়েছে, তোমরা কাদা ওড়াও।

তবে রে—

পাঁচখানা গ্রাম আমরা একত্র আছি। দেখি বুড়োর কত বল-বুদ্ধি !

ভগীরথ আস্তে-আস্তে গুটিয়ে নিল নিজেকে। যাবার বেলায় সে একটি গাড়ি পর্যন্ত পেল না। চলল পায়ে হেঁটে। পিছনে দুয়ো-দেওয়া ছেলে-ছোকরার ভিড়। হাততালি আর ঠাট্টা-তরজা !

তবে আর কি ! উলু দাও, শাঁখ বাজাও। গ্যাসের

আলোগুলো জ্বালাও নতুন করে। শামিয়ানা খাটাও। পুরোত ডাকো। সব জোগাড়জান্তি করে ফেল চটপট। সুধীরের সঙ্গে সুধার বিয়ে।

কিন্তু, কনে ? কনে কই ?

কনে উধাও। কনে লোপাট। উড়ন পাখি উড়ে পালিয়েছে।

'এঁ্যা, হল কি ?' মধুবাবু তেড়ে এলেন বহুবল্লভের দিকে : 'দাঁত-মেলা ! তু তো ঘরের লোক, এ সন্ধান আর রাখতে পেলিনে ? এত খাটুনি সব বরবাদে গেল ? এত রাগ উঠেছে যে ইচ্ছে হচ্ছে তোর গালে ঠাসঠাস করে চড়িয়ে দিই।'

বহুবল্লভ তেড়ে গেল তার ছোট ভাই সতীশের দিকে : 'তু কি করছিলি ? অতবড় হাঁড়াগাঁড়া মদ্দা মুনিষ, তুমি সর্বনাশ করেছ। শুয়ার ! আহাম্মুক ! মনে হচে তোকে চুটিয়ে কাটি। গর্ধভ কোথাকার !'

ভগীরথের বড় জামাই মাস্টার ছিল এ পক্ষে। তার দিকে তেড়ে গেল সতীশ। বললে, 'এ সব মামলার তুমি কচু বোঝ। কেবল মুখে আড়ম্বরী। বুঝলে কত্তা, মাস্টারি তো কর, ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রং— ন চ বিদ্যাং ন চ পৌরুষং—'

আবার মাস্টার গেল আরেকজনের মুখে।

মধুবাবু বললেন, 'আমি আর এর মধ্যে নেই। যত সব গাড়োল চাষা—'

তুমি এর মধ্যে নেই, কিন্তু আমরা ছাড়ছিনে। আমরা পাঁচগাঁয়ের পঞ্চজন। আমরা এর শেষ পর্যন্ত দেখব।

বোঝাই যাচ্ছে, ভগীরথের বাড়িতেই মেয়েকে সরিয়েছে। চলো সেখানে। ঘেরাও করো বাড়ি। আগুন লাগাও।

ভগীরথ বাড়ি ফিরে বলছে শম্ভু কুনাইকে : 'আমাকে তুমি মিছিমিছি সাধছ। আমি কি আমার নিজের বিয়ের জন্যে এত কাণ্ডকারখানা করেছিলাম? আমি জানতাম বুড়োর বিয়েতে কি ব্যাপার ঘটে। তাই একটু বুদ্ধি খরচ করে যার জিনিস তারই হাতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছি। খুশি মনে বাড়ি ফিরে যাও শম্ভু, ওদেরকে সুখী হতে দাও। শাড়ি-গয়না টাকা-পয়সার জন্যে কিচ্ছু তোমরা ভেবোনা। ও আমি মেয়েকে যৌতুক দিলাম। কিছু জমিও না হয় দিয়ে দেব কালাচাঁদকে—'

হৈ-হৈ করে পঞ্চজন এসে পড়ল ভগীরথের বাড়ি।

লোকজন কই? বিয়ে-বাড়ি বিয়ে-বাড়ি মনে হচ্ছে কই?

শুধু কটা লোক দোরগোড়ায় বসে জটলা করছে। বরযাত্রী গিয়ে কোথাও কিছু খেতে পায়নি বলে তাদের রাগ।

যা, যা, কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিসনে। শির নাই তার শিরঃপীড়া। মূলে মাগ নাই তার ফুলশয্যা। লোকটার কি কঠিন মানহানি হল, দেশময় কলঙ্ক রটে

গেল— তার উপরে আবার খাওয়ানোর কথা বলিসনে— লোক্‌টাকে একটু ঠাণ্ডা হতে দে—

কিসের ঠাণ্ডা! ভোজ না পেলে আমরাও ঠাণ্ডা হচি না। ও বড়লোক আছে, আপনার আছে, লাঙ্গলঠেলা চাষাদের নেমন্তন্ন করে কেন? আমাদের নিয়ে কেন এই নেকড়ানেকড়ি?

এমন সময় এল সব হৈ-হৈ-এর দল। কোথায় বিয়ে হচ্ছে? কোথায়?

বিয়ে আবার কোনখানে? বুড়ো তো ছন্ন হয়ে পড়ে আছে ঘরের মধ্যে। খাবি খাচ্ছে। দেখে এস কেনে।

আর আমরা হচ্ছি— হাতে নিয়েছি চিরুনি, মাথায় নাই কেশ। একবেলা এক সন্ধ্যা খেতে পেলাম না গা?

সত্যিই তো। ঘরের মধ্যে ভগীরথ দাবা হুঁকোয় তামাক খাচ্ছে।

কন্যে কই? সুধা কই?

আমি কি জানি। খুঁজে দেখ আনাচ-কানাচ। উঁকি মারো ঘোঁজে-ঘাঁজে।

জ্যানে তো ভগীরথই জানে।

সুধা আছে ভগীরথের বড় জামাই ত্রৈলোক্যের বাড়িতে। সেখানে কালাচাঁদের সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে লুকিয়ে।

এক জ্ঞাত-খুড়ো জোগাড় হয়েছে সুধার। সেই কুশ ধরে সম্প্রদান করছে। ঘাগু পুরোত ঠাকুরই সব বিধিব্যবস্থা করেছেন। . তার উপর ভগীরথের মেয়ে আছে। সেই নেবে সব করিয়ে-কম্মিয়ে।

সবঁ ঠিকঠাক করে রেখেছে ভগীরথ। বা বলতে পারো সেই পাকা-হাড় পুরুত ঠাকুর।

সঙ্গে মোটর আছে ওদের। টাকা আছে। বিয়ের পরই মোটরে করে খাগড়াঘাট চলে যাবে। সেখান থেকে ট্রেন ধরবে কলকাতার।

হলও তাই।

সুধার বিয়ে হয়ে গেল কালাচাঁদের সঙ্গে। শুভদৃষ্টির সময় চোখ চাইতে গিয়ে সুধা দেখলে, স্পষ্ট কালাচাঁদ। হুবহু কালাচাঁদ।

সেদিন বেরিয়েছিল পায়ে হেঁটে। আজ মোটরে। কত সুখ-শান্তির মধ্যে। তবু সুধার কেমন যেন একটুও নতুন লাগল না। আরেকরকম লাগল না।

সত্যের মত লাগল, স্বপ্নের মত লাগল না।

মনের অন্ধকারে চোখ পাঠিয়ে সুধা সুধীরকে দেখতে পেল না।

গঙ্গাযাত্রা

'বুলিসনে, উ কথা বুলতে নাই। বমভোল আমাদের দেবতা। আমরা যদি ওদের কাজকম্ম না করব, তা হলে করবে ক্যারা? লে, ডাক, সব জুটেপুটে সকাল করে বেরিয়ে পড়— হাঁ রে, সুধীর আছে? আ কাড়ছিস না যে রে? ভাত খেঙেছিস তো, দে হুঁকো দে—'

হুঁকো দিয়ে পান্নু মোড়ল বললে, 'এই ছ্যাখ দামুদা, তু আগাগোড়া না বুঝে হড়বড় করে বকে যাস। তাইতে বেজায় আগ-তুঃখ হয়। বামুনেরা যখন ঠেলায় পড়ে তেখুনি এই চাষাদিকিন ডাকে। আর অন্য সময়ে, খাবার সময়ে, বলে, ও চাষা, হবে পরে হবে। বামুনদের অনেক উবকার করে দেখলাম। ওরা বেজায় বজ্জাত—'

'আরে এ তো ই-দিশি বামুন লয়, এ বামুন পাকিস্থলী হনে আলছে।'

সে আবার কি। পান্নু মোড়ল তাকিয়ে রইল।

'ঐ যে রে— পাপীস্থান না পাখীস্থান হয়েছে— সেই মুলুকের লোক। বাঙাল বামুন।'

যেই বামুনই হোক উপকার করতে নাই। বাঙাল তো, গাঁয়ের শ্মশানে পুড়িয়ে দিক না। গঙ্গায় যাবার সাধ হয় কেন? ওদের দেশে গঙ্গা দেখেছে কোনোদিন? বিভুঁয়ে যখন মরতে এসেছে তখন আবার গঙ্গা না পুকুরের গাবা অত দেখবার কী দরকার!

কি বলিস তার ঠিক নাই। যখন গঙ্গার সীমানার মধ্যে এসেই পড়েছে তখন কার না ইচ্ছে হয় গঙ্গাতীরেই দাহন হোক। তাই বুড়োর স্ত্রী চাটুজ্জে মশায়কে ধরেছে। আর চাটুজ্জে মশায়ের কথায় আমি তোদের কাছে এসেছি।

তা তুমি এসেছ ভালই করেছ। কিন্তু ঐ চাটুজ্জে মশায়ের কোনো কাজ করতে আমাদের মন সরে না।

'বলে কি জানিস? বলে চাষারা সব মড়া গঙ্গায় দেয় না, নদীতে ফেলে দেয়, নইলে কুমিরের গোলের মুখে মড়া রেখে গোয়ালদের বাথানে গিয়ে ঘুম মারে। এই সব কথা শুনে মন কেমন হয় বোল্ দিকিনি। কাজ কামাই করে তিন-চারদিন কষ্ট কত্তে লোক যাবে ক্যানে? আরো তো পাড়ার অনেক আছে—ডাকো সমাইকে, তারপর যা হয় তাই হবে।'

যে লোক সুপারিশ করতে এসেছে সে গাঁয়ের চাষাদের

একজন মাথাল-মুরুব্বি। নাম দামোদর। রামহরি চাটুজ্জে আবার তাকে ডেকে পাঠাল।

'কি ব্যাপার বলো তো? তোমরা থাকতে এ বিদেশী দুঃস্থ ব্রাহ্মণ গঙ্গা পাবে না? শেষকালে শ্মশানে পুড়িয়ে দেব? সন্ধে হল, যা হয় কথার একটা শেষ কর। ভদ্দরলোকের স্ত্রী তো যা লাগে সব টাকা দিতে রাজি—'

'আচ্ছা, মড়া আপনি শ্মশানে পাঠিয়ে দিন। আমি দেখছি। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

গায়ের বাইরে একটা পতিত ডোবার ধারে শ্মশান। সেইখানে মুখাগ্নি করে লাশ পেশাদার মড়া-ফেলাদের হাতে ছেড়ে দিতে হয়। সব চেয়ে নিকট গঙ্গা এখান থেকে বারো তেরো মাইল, সারা রাস্তা বুনো ঝোপে-ঝাড়ে ভরা, কোথাও বা দ, কোথাও বা স্পষ্ট নদী! ডোঙাতে-নৌকাতে পার হতে হয় মড়া নিয়ে।

ভদ্দরলোকদের সাধ্যি নেই মড়া কাঁধে নিয়ে অতটা পথ হাঁটে, রাস্তার অত ঝঞ্ঝাট পোহায়। তাই টাকা কবলে পরের হাতে মড়া ছেড়ে দিতে হয়। মড়া-বওয়া লোকেরা ভাবে, একটা দাঁও জুটেছে।

ভুঁড়ি চুলকোতে চুলকোতে দামোদর মণ্ডল আবার এসে দাঁড়াল মজলিশে। বললে, 'তোরা এ গাঁয়ের মান সম্মান আখবিনে? আমার মুখটা ছোট করে দিবি? আমহরি

চাটুয্যের সঙ্গে ঝগড়া বলে ঐ বিদেশী বামুনের তোরা গতি করবি না ?'

কানিকুড় লাফিয়ে উঠল। বললে, 'আমি যেতে আজ্জি আছি, সব কটা যদি আমাদের জাত হয়। ঐ যে তুমরার লবশাক— ও আমি মানতে চাই না। ঐ শালা তাঁতির সঙ্গে এক কাঁধে মড়া বইব না। শালার তাঁতি বলে কি, সৎগোপের চেয়ে তাঁতি বড় !'

'এ গাঁয়ে লোক কুলোয় না বলেই তাঁতি-তামিলি কামার-কুমোর ধরতে হয়।'

'ক্যানে ভিন গাঁ থেকে আনাও, তাঁতি বাদে অন্য জাত লাও। তাও হবে না ? নোকই বা চাই কত ? ন-দশজন হলেই হবে। আমরা হব ছ জন, আর তিন-চারজন হবে না ? না হয় নাই হবে। ছ জনাতেই যাব। কষ্ট হবে, তার আবার কি !'

'তা হলে বেরিয়ে পড় সব। তারা তো শ্মশানে চলে গেছে। তোমাদের সবাইকে এক জায়গায় এক কথায় না পেলে আমি গিয়ে বুলব কি ? সেটা বোঝো ?'

'শুদু আমাকে বললে তো হবে না। আর সব কই ? আমার মনের কথা শুদু বললাম।'

'তোদের সব আক্কেল নাই ?' দামোদর ধমকে উঠল : 'সব চালই বাইশ পশুরী। টাকাও লিবি, আবার ঘোঁটও

করবি। যা, সব ডাক, বেরো, তারপর দেখছি। ক'জন হচে, তারপর অন্য কাউকে ডাকবার বেবোস্তা। আমি ঠাকুরদের কাছে চললাম।'

মড়া শ্মশানে পাঠিয়ে দিয়েছে রামহরি। দ্বিতীয় পক্ষের সব চেয়ে বড় ছেলেটির বয়েস তেরো চোদ্দ। সে গিয়েছে মুখাগ্নি করতে। আর কটি কাচ্চা-বাচ্চা, একটি বাড়ন্ত গড়নের কুমারী মেয়ে, তাদের মাকে ঘিরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বিদেশী বাঙালের পক্ষে গলা ছেড়ে কান্নাটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছে না। আর মা খালি মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে নিঃসাড় হয়ে। কেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে পারছে না এই তার লজ্জা।

মুনিষ এখনো জোগাড় হচ্ছে না। শীতের রাত, কনকনে হাওয়া দিয়েছে, এখন সবাই যেতে রাজি হলে হয়। সব তো গেছেই, বাড়ি-ঘর জোত-জমি সংসার-গৃহস্থি— এমন কি ভবিষ্যতের জীবিকা— তারপর মরার পর এই একটু গঙ্গাপ্রাপ্তিও জুটবে না ?

জুটবে। আপনি ব্যস্ত হবেন না। এই সব এসে পড়ল বলে। তবে এ রাত্তিরে বেরুতে চাইবে না হয়ত। বেরুলেও রাস্তার মাঝে এক জায়গায় বসে থেকে রাত কাটাতে হবে। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। মড়াটা গাছিয়ে রাখা যাক আজ রাতে। কাল ভোর ভোর ঠিক চলে যাবে কেঁধো-রা।

'তুমি যা ভালো বোঝো—' রামহরির এদিকে অনেক ব্যবস্থা বাকি।

'কিন্তু টাকা কত দেবেন?' দামোদব মুখে একটা কুণ্ঠিত ভাব আনল।

'তার জন্যে আটকাবে না।'

'আক্রাগণ্ডার বাজার। কেঁধো দশ-বারোজন হবে—কাঠ-মোট আছে, ঘাটের ডোম, চাল মুড়ি— বাজার আজকাল আর বসে নেই বাবু, খালি ছুটছে, ছুটছে, পই-পই করে ছুটছে—'

'সে একটা বিবেচনা করে দিতে হবে বৈকি। তোমার এখনো লোকই জোগাড় হল না।'

না হয়েছে। কানিকুড় এসে বললে, 'নোক সব ঠিক হয়েছে। আমরা সাত জন, কম্মকারদের দুজন, আর ভোপেন নাপিত— এই দশ জনাতেই হবে। পথ এখন খরাশুকনো বটে, তবে এ আত্রিতে কেউ যেতে চাইছে না, বলছে—খুব শীত, সারা আত্রি কষ্ট হলে দিনে তখন হাটব কি করে? মড়া আজকের মতন গাছিয়ে থুলে ভাল হয়। কাল ঠিক আত থাকতে সম-সম কালে উঠে পড়ব সবাই। নদীতে এখন পার-পারোয়ারী নাই, শাঁ-শাঁ করে চলে যাব এক বগগা।'

তাই ভালো। যে কজন মুনিষ জোগাড় হয়েছে সঙ্গে করে দামোদর শ্মশানে চলল। মুখাগ্নি সারা হতেই খাটুলি-

সমেত মড়াটা একটা আমগাছের উপর খড়ের দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখল।

যেখানে যা বিধি-ব্যাপার তাই পালন করতে হবে। সমস্ত পরিবার তাই কিছু জিজ্ঞাসা করে না, প্রতিবাদও করে না। এ অঞ্চলে তারা বিদেশী, তারা বাঙাল, যেন উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, চোখেমুখে এমনি একটা ভয়খেকো অপরাধীর ভাব। যতক্ষণ শ্বাস আছে পরের দয়ার উপরই বাঁচতে হবে এমনি একটা নিঃসম্বল অবোলা প্রাণীর কৃতজ্ঞতা। এখানে এসে তাদের একজন যে হঠাৎ মরে গেল, এই যেন তাদের কত বড় ত্রুটি।

রামহরিই তাদের জন্যে যা করেছে। তাই রামহরির দিকেই তারা এগিয়ে থাকে।

'এমনি সব মড়াকেই গাছায়। এ কিছু নতুন নয়। শীতের রাতে কেঁধোরা যদি চলতে না চায় তবে মড়া এমনি গাছেই বেঁধে রাখে।' একটু কৈফিয়ৎ দেবার মত করে রামহরি বলে।

প্রমীলা আর তার নাবালক ছেলে-মেয়েরা অবোধের মত একবার তাকায়।

'আমরা এবার তবে বাড়ি ফিরি।' বললে কানিকুড়।

'ঠিক-ঠিক সময় ডাক দিলে উঠবে তো? না, তখন ঘুমের ঘোর ছাড়বে না?'

'ঘোর ছাড়বে না— একি তামাসার কথা ?'

'আমার মন বলছে এই রেতে গেলেই ভাল হত।' বললে ভূপেন নাপিত : 'পথে এক জায়গায় আগুন-টাগুন জ্বেলে একটু বিচরাম কল্লেই হত। তা আর সমারি মন সমান হল না।'

'তা যা হবার তো হল— এখন, বাবু দাদা, টাকা কত দেবেন বলুন দেখি।' সবাইর সামনেই দামোদর কথাটার আস্কারা করতে চাইল : 'গঙ্গাতীরে বেজায় খরচা। দোকানদাররা মড়াওলা দেখলেই দু পয়সার জিনিসে আট আনা দাম ধরে। হাতী বেকচ্চায় পড়লে চামচিকেও লাথি মারে আজকাল।'

'এক বস্তা চাল আর মুড়ি আর এক ঘটি গুড় আমি দিচ্ছি। আর—' ঘরের মধ্যে ফাটা লণ্ঠনের আলোতে প্রমীলাকে একবার দেখতে চাইল রামহরি। 'আর নগদ টাকা গোটা ষাট।'

দলের ভিতর থেকে রগচটা দুকড়ি ঝাঁজিয়ে উঠল : 'দশ জন নোক যাব— তাও কেও ঢোসা নোক লই, ঘেসো ভুঁড়ি লয়, সব জোয়ান মর্দ— দশ জন না হলে ঐ বুড়ো মড়া বেজায় ভারী হবে, টানব কি করে ? ঐ ষাট টাকায় কি হবে ? প্যাট পর্যন্ত নামবে না। প্যাট তো এখানে থুয়ে যাব না মশায়। সঙ্গে যদি কিচ্ছু যায়

প্যাটই যাবে। প্যাটে দুটো না খেলে হাঁটব কি করে?’

খুব কড়া তাকেই রয়েছে আর সবাই। কানিকুড় বললে, ‘বেশ, আপনারা একজন সঙ্গে চলুন কেনে। ষাট টাকা ছেড়ে দশ টাকায় হয় আমাদের আপত্তি নাই। তিন বেলা আন্না, চারবেলা জল খাওয়া। ঘাটের ডোমের পাওনা, কাঠ-মোট— ঘি— হিসেব করুন কেনে—’

‘কত, চাও কত তোমরা?’ রামহরি দামোদরের শরণ নিল।

দামোদর মুখ গম্ভীর করে বললে, ‘ছ কুড়ির কম হবে না।’

‘বিদেশী লোক, সব ফেলে-বেচে উদ্বাস্তু হয়ে চলে এসেছে —এদের বেলায় একটু কমসম করে না নিলে চলবে কেন দামুদা?’ রামহরি তাকাল আরেকবার প্রমীলার দিকে।

প্রমীলা ততক্ষণ উঠে বসেছে মাটি ছেড়ে। পাড়ার মেয়েরা যারা তাকে ঘিরে বসেছিল এতক্ষণ, আস্তে আস্তে একে একে উঠে চলে গিয়েছে। ফাঁকায় একবার চোখোচোখি হয়ে গেল।

যেন বলল, আমি আর কি বলব? আমার আর কি বলবার আছে? দর-দামের আমি কি জানি? আপনি যা ভাল বোঝেন করুন। আমার স্বামী যেন গঙ্গা পায়। লেখাজোখা নেই এত ধকল গিয়েছে তাঁর উপর দিয়ে। যেন গঙ্গাতীরে একটু শান্তি পান শেষ দিনে।

মরার আগে অনেক করে বলে গিয়েছে প্রমীলাকে, ভিটে-মাটি ছেড়ে যখন এদেশেই চলে এলাম, তখন মা-কালী করুন, যেন গঙ্গা পাই। জ্ঞান-গঙ্গা তো হবে না, অন্তত গঙ্গাতীরে দাহনের ব্যবস্থা কোরো।

স্বামীর অসুখ বাড়াবাড়ি হয়ে উঠতেই একশোটা টাকা প্রমীলা রামহরির কাছে জিম্মা রেখেছিল। বলেছিল, যখন যা দরকার খরচ করবেন। যতদূর সাধ্য, চিকিৎসার যেন ত্রুটি না হয়। যে ভাবে পারেন, বাঁচিয়ে তুলুন ওঁকে—

বাঁচানো গেল না। অনেক করেছে রামহরি, তবু বাঁচানো গেল না। এখন মরণে অন্তত একটু আসান হোক। এ জন্ম তো গেল, যদি এর পরে আর কোনো জীবন-জন্ম থাকে!

দলের মধ্যে সুধীরই খুব করিয়ে-কম্মিয়ে। সে খেপে উঠে বললে, 'যদি মাশায় টাকার কঁ্যাচ করেন তা হলে কেও যাবে না। সোজা কথা মাশায়। তা হলে মড়া নামিয়ে পুড়িয়ে দেন গা।'

'তা নয়তো সঙ্গে চরণদার দিন, সে দেখুক কোথায় কত টাকা লাগে—' তুকড়ি টিপ্পনি ঝাড়লে।

তেমন কোনো আত্মীয়স্বজন হলে হত! কে আছে ওদের? এই কটা নাবালক শিশু। রামহরি স্নেহকরুণ চোখে তাকাল সবাইর দিকে।

'আর চরণদার দিলেই বা কি। যা বলবে ঘাটের ডোকল তাই আদায় করে লেবে। নইলে ঝিল সাজাবে না।' বললে কানিকুড়। 'ঘাটওলা, দোকানওয়ালা, ওরা কি আমাদের থেকে কিছু আলাদা ?'

'তোমাদের কি এদের মুখের দিকে চেয়ে একটু দয়া মায়া হয় না ?' রামহরি আবার মিনতি করল।

'আমাদের মুখের দিকে কোনো শালো তাকায় তো কই দেখি না। যে সদ্গতি করে দেবে তারই বেলায় পয়সা নাই। ঐ যে বলেছে না, যে এল চষে সে থাক বসে, নাড়াকাটাকে ভাত দাও, খাক ঠেঁসে ঠেঁসে। এখানে এসে দিব্যি তো একটুকবো জমি লিয়েছে, ঘর তুলেছে একখানা —পয়সা নাই তা মানব কেনে ?' বললে সুধীর।

ভূপেন নাপিত একটু মোটা বুদ্ধি। বললে 'তুইই যখন গেলি তখন জমি-বাড়ি এখে লাভ কি ? যার জমি-বাড়ি তার কাজেই খরচ হয়ে যাক। এতেই তো শেষ লয়, এর পর ভোজফলারেরও তো জোগাড় দেখতে হবে—'

দূর ছাই ! দরকার নেই গঙ্গায় গছিয়ে। শ্মশানেই দাহ হয়ে যাক। কি মনে করে রামহরি নিজেকে আবার তক্ষুনি গুটিয়ে নিল। না, বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল লোকটার। এই যে না-জানা রাস্তা ধরে চলে আসা, এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে— এটাকে সে একটা তীর্থযাত্রার মূল্য দিতে

চেয়েছিল। যদি মরি যেন গঙ্গাতীরে দাহ হয়। উদ্বাস্তু-উদ্ধারিণী গঙ্গা।

'বেশ, মুনিষ সব তোমরা ঠিক থেক। যাও, ঘ্যানরঘ্যাং কোরো না— আশি টাকাই দেব। আশি টাকাই আমার কাছে আছে।' রামহরি বললে শেষ কথা।

'হেরজা হোরজা করে পাঁচ কুড়ি টাকাই দিয়ে দেবেন।' বললে দামোদর। 'সব ব্যালেক্ মার্কেট মাশায়, সব ব্যালেক। আঙ্গার-ধোঁয়াও ব্যালেক।'

'না, এর বেশি আর এক পয়সা নয়।' রামহরি হুমকে উঠল।

সব চেয়ে বড় ছেলেটিও যেন তাতে সায় দিয়ে রামহরির পাশ ঘেঁসে দাঁড়াল।

কানিকুড় বললে ছেলেটিকে লক্ষ্য করে: 'গঙ্গার দেশে এসে গঙ্গা দিতে না পারাটা অধম্ম। তা এখন বাপু কি করবা? দেশের আজকাল বোলচালই এই রকম। তাছাড়া বাবা তো বারে বারে আসবে না। এ দায়ই তো একবার—'

'না, তোমাদের দিয়ে হবে না। আমি মাতুনগর যাচ্ছি।' রামহরি নিজের বাড়ির দিকে এগুতে লাগল: 'সেখানে আমাদের প্রজা আছে খাতক আছে। ওদিকে ধরলে নিশ্চয়ই কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে। তোমাদের মত তারা এমন অমানুষ নয়।'

মাতুনগর এখান থেকে প্রায় তিন পো রাস্তা। তা হোক গে। বাড়িতে বাঁধা মুনিষ আছে, তার হাতে একটা লণ্ঠন আর নিজের হাতে একটা তেলে-পাকানো লাঠি নিয়ে সটান চলে যাবে রামহরি। সে যখন মনে করেছে তখন সমাধা সে করবেই।

বাজি চটিয়ে দেয়া হল নাকি হে?

রেখে দাও। মাতুনগরের লোকেরা দেড়শ টাকা চাইবে। তার এক আধলা কম নয়।

আর ও অমনি মাতুনগর যাবে তুমি বিশ্বাস করলে? ও শুধু একটা ভুজুং দিয়ে দর নামাবার চেষ্টা।

তাছাড়া আবার কি! সেখানে ওর কত প্রজা, কত খাতক! খাজনা বলতে দু আনা তিন আনার কোর্ফা আর খাতক বলতে চার-পাঁচ টাকার হ্যাণ্ডনোট। যত বারফট্টাই ঐ বাঙালদের সামনে কোরো। আমাদের চোখে ধুলো দিতে হবে না।

হ্যাঁ বাবা, খুঁটি আঁকড়ে পড়ে থাক। আমাদের দর ঠিক মেনে নেবে।

বড় ছেলেটি এসে দামোদরকে ডেকে নিয়ে গেল মার কাছে।

'দামুর কথা ছামু-ছামু। পাঁচ কুড়ির কম হবে না। পাঁচ কুড়িই লেয্য টাকা।'

'ওঁর হাত থেকে আপনারা আশি টাকাই নিন, বাকি কুড়ি টাকা আমি লুকিয়ে দিচ্ছি।' ছেলেকে দিয়ে প্রমীলা বাক্স খোলাল। টাকা দেওয়াল কুড়িটে। বললে, 'মুখে-মুখে ওঁর কথাটা মেনে নিন— মোটমাট আপনাদের পাওনা ঠিকই মিটে গেল। বাড়তি টাকা পাবার কথাটা ওঁকে জানতে দেবার দরকার নেই। কাজটা ভালয়-ভালয় সেরে দিন। ওঁকে আমরা অনেক কষ্ট দিয়েছি—'

'না না, কষ্ট কি। কাজ আমরা ঠিক উদ্ধার করে দেব।' দশ টাকার নোট দুখানা দামোদর কাপড়ের খুঁটে গিঁট পাকিয়ে-পাকিয়ে বাঁধল।

সুধীর বললে, 'নগদ টাকা মাইরি— আগাম। চল্, সনজের ঝোঁকে দু-পাত্তর আগে হোক—'

দামোদর একবার ভাবলে রামহরির সঙ্গে রফানিষ্পত্তিটা আগে সেরে রাখি। মাতালশালার নাম শুনে মনটা অন্য-দিকে ভেসে পড়ল। কিন্তু যার-যার ভাঁড় তার-তার পয়সা। এ টাকা এজমালি।

সব শুতে যাবে-যাবে এমন সময় মাতুনগরে পৌছুল রামহরি।

দু হাঁটুর ফাঁকে হুঁকো চেপে ধরে মাথা হেঁট করে আস্তে-আস্তে 'ব'-টান দিচ্ছে অধর, রামহরি কাছে এসে দাঁড়াল।

'একি, চাটুজ্জে মশায়? এত আতে? কি মনে করে?'

'ব'-টানের পরে ছোট করে 'শুঁ'-টান আর মারা হল না, অধর হুঁকো গুটোল।

তোমাকে কজন 'কাঠুরে' জোগাড় করে দিতে হবে। গাঁয়ের লোক কেউ গঙ্গা দিতে যাবে না। অসম্ভব টাকা হাঁকছে। তাই বিপদে পড়ে তোমার কাছে আসা। তুমি আমার আপ্তজন।

মরেছে কে ?

"পাক-স্থলী"র এক বামুন। সর্বস্ব খুইয়ে এসেছিল বিভুঁয়ে, শেষকালে নিজের দেহটাও ছেড়ে গেল। তেমনি করে আমরা যারা পড়শী, গ্রামবাসী, আমাদের কি ছেড়ে দেওয়া উচিত ?

'পাকস্থলী-পূর্বস্থলী যে থলিরই হোক, বামুন যখন, তখন যেমন করে হোক, দায় উদ্ধার করবই। কোন ভয় নাই। যা লোক লাগে আমি সব জোগাড় করে দিছি।'

'কত টাকা লেবে ?'

'আমরা তো চামার নই যে গলা কাটব! ওরা যা চেয়েছে তার চেয়ে দশ টাকা কম দেবেন।'

'কথাটা ঠিক হল না। ওরা যদি এখন তুশো টাকা চায়, তোমাদের তা বলে একশো নব্বুই দেব ?'

'আরে মশাই, অত হিসেব কি আমরা জানি ?' অধর ফিরল। 'কত দিতে চান আপনারা ?'

কম করেই আরম্ভ করা ভাল, ক্রমে ক্রমে ধাপে ধাপে উঠবে না-হয় শেষে।

'সত্তর দেব।'

'তাই দেবেন। বিদেশী বিপন্ন লোক, জুলুমবাজি ঠিক লয়। আপনি বসুন কেনে ঐ মোড়াটায়, আমি লোক দেখি।'

অধর পাড়ায় বেরিয়ে পড়ল। কিছু দূর এগুতেই দ্বিজপদর বাড়ি। তাকে তুললে ডাকিয়ে, বললে, শল্যা-পরামর্শটা দাও দেখি। কি করা।

'মড়াটা গোছতে হবে বৈকি।' বললে দ্বিজপদ: 'টাকা কম হয় আসবার সময় ময়রার দোকানে মড়ার নামে খাতায় বাকি রেখে ডবল পুষিয়ে লোব। সেই বাকি টাকা মড়ার ওয়ারিশানরাই দিক বা রামহরি চাটুজ্জেই দিক তা আমাদের জানবার কথা লয়।'

'আরে, ময়রার দোকান তো সব আমাদের চিনহা হে— ঠিক হবে।'

জন আষ্টেককে রাজি করানো গেল।

'টাকা বেজায় কম হচ্ছে অধরদা। এই শীতের রাতে বিছানা ছেড়ে উঠে আলাম— একটা বিবেচনা করতে হয়।'

দ্যাখ, মড়া গঙ্গায় দিয়ে আসা— এর মত বড় কাজ আর

নাই ভোমগুলে। আগের দিনে গাঁয়ের লোকেরা নিজের ঘরে থেকে চাল মুড়ি টাকা চাঁদা করে দিয়ে কাঁধ বদ্‌লে-বদ্‌লে মড়া গঙ্গাতীরে নিয়ে গিয়ে সৎকার করে দিয়ে আসত। আজকাল অবস্থা দোষে এ কাজ আমাদের ব্যবসা-রোজগার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তাই বলে একে একটা দাঁও ঠাওরানো ঠিক নয়। বুক-চাপ হয়ে কাজ বাগানো অধর্মের কথা। এদিকে মড়া যায় স্বর্গস্থলীতে, আমরা নরককুণ্ডে।

'নরম মাটি দেখলেই বেড়াল আঁচড়াবে এ কি লজ্জার কথা! আচ্ছা বাবু, বোলচাল করে ছোঁড়াগুলোকে আমি পটিয়ে লিচ্ছি, আপনি আর দশটি টাকা বেশি দিন।' অধর মুরুব্বির মত বললে, 'একেবারে বিছানা হনে উঠে আলছে, একটু বড় তামাক-টামাক চাই আর কি। ভূত তাড়াবার জন্যে হরিবোল আর ঘুম তাড়াবার জন্যে বড় তামাক।'

'দেব আরো দশ টাকা, মোটমাট আশি। এখুনি বেরুবি তো?' রামহরি সবাইর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

'এখুনি বেরুব। এই দণ্ডে। শীত বর্ষা মানি না আমরা। কি রে', অধর দূরের দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়ল, 'কি রে, তোরা আবার বসলি কেনে? এককেজনে একেক রকম ফ্যাচাং তোলে। যাই, শুনে আসি, শুদিয়ে আসি।'

দুটো লোকের সঙ্গে কি-কতক্ষণ কানাকানি করল

অধর। তার পরে গলা উঁচু করল। ছি ছি ছি, একি কথা! আমাদের যে মালিক আমাদের যে মহাজন, তাকে অবিশ্বেস! টাকা তোরা আগে চাস? কে কবে কাঠুরে-ভোজনের পর টাকা না দিয়ে বলেছিলো এই ভোজনেই টাকা উশুল হয়ে গেল, তার সঙ্গে চাটুজ্জে মশায়ের তুলনা? ডোম-ডোকলের টাকা কাঠ-মোটের টাকা আগে লিবি বই কি। না, বেশ, খাই-খরচের বাবদেও কিছু লে। আর যেটা নিছক মজুরি বা বিদেয় সেটা না হয় ঘুরে এসে বুঝসুঝ করলি। দু পক্ষেরই আসান কর। পঞ্চাশ আগে লে— ওরে বাবাঃ, একেবারে যে ফোঁস-চক্কর একেকটি। সব টাকা এক মুস্তে না পেলে গা তুলবি না কেউ? অমনি গতরে জং ধরে গেল?

'পুরোপুরি আশি টাকাই আগাম দিচ্ছি।' রামহরি টাকা বের করতে লাগল গেঁজে থেকে। 'যাও, বেরিয়ে পড়। আর তানানানায় কাজ নাই।'

অধরের দল হাজির হল সেই শ্মশানের আমতলায়। গাছ থেকে খাটুলি-সমেত মড়া নামিয়ে আবার বাঁধলে দড় করে। বল হরি— হরি বোল— চার কাঁধে ফেলে চলল গঙ্গামুখো পথ ধরে। একজনের মাথায় চাল-মুড়ির বস্তা, একজনের হাতে গুড়ের ঘটি, একজনের হাতে হেরিকেন আর একজনের হাতে লাঠিসোটা।

গঙ্গা, ভীষ্মজননী— গঙ্গাযাত্রীদের রওনা করিয়ে দিয়ে রামহরি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল।

রাত আড়াইটে তিনটে হতেই দামোদর তার দলের লোক গোল করলে। বললে, আমি আর কানিকুড় চাল-মুড়ি আনতে চললাম, তোরা মড়া নামা গে যা। কই রে, সুধীর কই?

চাটুজ্জে মশায়ের বাড়ির দরজায় ডাকাডাকি করতে লাগল দামোদর। সাড়াও নাই শব্দও নাই— সব নিটুট নিঝুম। এর মানে কি? সুধীর কিংবা পানু এসে তবে কি সব চুকিয়ে নিয়ে গিয়েছে? পানু তো আর সবাইর সঙ্গে শ্মশানেই গেল। তবে, ঠিক, সুধীরেরই এই কাণ্ড, আগ বাড়িয়ে লাফ দেওয়া। সুধীরই এতক্ষণ গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। চল, শ্মশানে চল, সেখানে গিয়েই সব খোলসা হবে।

শ্মশানে গিয়ে সবাইর চক্ষু স্থির। গাছে মড়া নাই।

সবাই গাছের দিকে তাকিয়ে। কেউবা আশে-পাশের ঝোপঝাড় খুঁজছে, কেউ বা হাতিয়ে দেখবার জন্যে উঠছে গাছের উপর। ফুস! কোথাও কিচ্ছু নাই।

কি সর্বনাশ! মড়াতে শ্মশান চাপল নাকি?

'আমাদের কথায় ওরা মড়া গাছিয়ে থুলো। আর, মড়া নাই।' দামোদর আকাট বনে গেল।

'উঁহু। এ কারু চালাকি। অন্য লোকে এসে লিচ্চয় মড়া লিয়ে চলে গিয়েছে।'

'এখন করা যায় কি! আমার হাতে টাকা,— কি ব্যাপার!' দামোদর জনে-জনে তাকাতে লাগল মুখের দিকে।

'দাও টাকা, কুড়ি টাকা কুড়ি টাকাই সই।' বললে কানিকুড়: 'আমরা পথ ধরব, মড়া ধরব গিয়ে রাস্তায়। আর কিছু লয়, শালা তাঁতিতে যুক্তি করে লিচ্চয় মড়া লিয়ে পালালছে। চল তো সব দৌড়ে, দেখি আমাদের মড়া লিয়ে শালারা কদ্দূর যায়!' কানিকুড় পিছন ফিরলে: 'তুমি মোড়ল বাড়ি যাও। আমরা চললাম গঙ্গাতীর— হকের মড়া ছাড়ব না কিছুতেই। আয় তোরা এক সঙ্গে। লাঠি লে।'

আরেক দল মড়া নিয়ে চলেছে এ পথ দিয়ে।

ওরে, হাঁটার বেগ কিছু কমিয়ে দে ছোঁড়ারা। পথি-মধ্যে অন্য মড়ার সঙ্গে হওয়া ভাল লয়।

'তোমরা কোন গাঁয়ের হে?' জিগগেস করলে অধর।

'আমরা আসছি জটারপুর থেকে।'

'যাচ্ছ কোন্ ঘাটে?'

'সাঁটুয়ের ঘাটে যাব মন লিছে। চল না একসঙ্গে যাই।'

'না ভাই তোমরা আগিয়ে চল, আমাদের আবার এক-

জনার পায়ের গোলুই ছেড়েছে, আবার আরেকজন রাত-কানা। আমাদের অনেক দেরি।'

'বেশ তো, এসো কেনে, একসঙ্গে কোথাও বসে জিরোই। পরে ভোর হলে যাওয়া যাবে একসঙ্গে।'

'ওরে বাবা, আমরা যাব কাঁট্‌লের ঘাটে। মাঝখানে এক আপ্তজনকে মড়া দেখিয়ে যেতে হবে আমাদের— এখন কতক্ষণে ভোর হয় কিছু ঠিক নাই। আমাদের লেগে বোসো না। তোমরা এগোও।'

পিছনের মড়ার দল চলে গেল এগিয়ে।

ক্রোশ দুই প্রায় হাঁটা হয়েছে, এবার বোসো কেনে এই বটগাছের তলায়। আগুন না পোহালে চলছে না। ঠাণ্ডার ধারে হাত-পা সব কেটে-কেটে যাচ্ছে। তামাক সাজ, লণ্ঠনটা জ্বালা, ঘুমুতে চাস যদি কেউ কেউ, শুয়ে পড়।

রাত্রি প্রায় শেষ হয় হয়। লিকলিকে চাবুকের মত বাতাস বইছে শাঁ শাঁ করে। ওরে, আবার কোনো মড়াওয়ালা আসছে নাকি? মানুষের গলার শব্দ শুনছি না? কে জানে, বিদেশী পথিকও হতে পারে।

কানিকুড়ের দল খুব তেড়ে-ফুঁড়ে ছুটে আসছে। নজর রাখছে চারদিকে। বেশি দূর যেতে পারবে না। পাখি তো নও যে উড়ে পালাবে। ঠিক ধরব।

'হ্যাঁরে, ঐ গাছের গোড়ায় একটা আলো দেখা যায় না?'

'হ্যাঁ, ঠিক হবে, ঐ শালারাই হবে।'

'এই দ্যাখ, হুঁ করলেই পানু আর ভোপেন দুজনায় খপ করেই মড়া তুলে নিয়েই পথ ধরবি।' বললে কানিকুড়: 'তারপরে যত যা হয় আমরা দেখে লোব।'

কাঁধ খালি, বিদেশী পথিকই কেউ হবে, অধরের দল নির্ঝঞ্ঝাট হল।

'কারা গো?' হাঁক দিল কানিকুড়।

'আমরা মাতুনগরের। দেবেশপুরের কে এক-বাঙাল বামুন মরেছে তাকে গঙ্গাতীরে লিয়ে যাব। তোমরা কোথাকার?'

'আমরা কোথাকার?' লণ্ঠনের আলোর এলাকার মধ্যে এসে পড়ল কানিকুড়: 'তোমরা কি রকম চলে এলে বল দিকি? আর যদি এলেই তো, আমাদিকে একটু সংবাদ দিতে পাল্লে না? আমরা মড়া গাছিয়ে থুলাম, কথাবাত্রা ঠিক হল— তোমরা ভিন গাঁ থেকে উপরপড়া হলে কি রকম? তোমরা তো খুব ভদ্দ লোক—'

'আমরা কি জানি?' অধরও গলা মোটা করল: 'আমরা ভাল মন্দ কি জানি। বললে, গাঁয়ের লোক আজি হলছে না, তাই তোমাদের কাছে আলছি। দায় উদ্ধার করে দাও। আমরা কি জানি। লেয্য টাকা দিলে আমরা আজি হলাম—'

'তাই বলে আমাদের গাছানো মড়া তোমরা নামাবে হাতে ধরে? আমাদের যজমান তোমরা কেড়ে লেবে?'

'মড়ার আবার শিষ্য যজমান কি! যে কাঁধে করবে তার।'

'যে কাঁধে করবে তার! বেশ, তাই—হুঁ—হুঁ—হুঁ—হুঁ—' সংকেত ঝাড়ল কানিকুড়।

আর অমনি চকিতে পান্নু আর ভূপেন দুজনেই খাটিয়াশুদ্ধু মড়া নিয়ে সামনের দিকে ছুট দিলে।

'পালালছে, পালালছে— আমাদের মড়া নিয়ে পালালছে—' অধর মরা কান্না জুড়ে দিলে।

ছোকরাদের ঘুম ছুটে গেল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ছুটে ধরে ফেলল, খাটুলি জোর করে নামিয়ে ফেললে মাটির উপর। বললে, 'আমাদের মড়া চুরি করে লিয়ে পালালছিস—'

'তোদের মড়া! আমরা চুরি করেছি?' পান্নু ঘাড়ের গামছা মাথায় বাঁধল।

'মড়া লিয়ে এতটা পথ আলাম— বিশ্রাম করতে একটু শুয়েছি কি না-শুয়েছি, কওয়া বলা নেই, খাটুলি তুলে লিয়ে ছুট দিলি— এ চুরি করা লয়?'

'আর আমাদের গাছের মড়া না বলে-কয়ে নামিয়ে নিয়ে এলি বাঁধন কেটে— তোরাই তো পয়লা চোর। গেছো চোর।' ভূপেন নাপিতও তেরিয়ার মত ভঙ্গি করলে।

'আমরা কি জানি! আমাদের বায়না-বরাত দিয়েছে,

মড়া লামিয়ে লিয়ে এসেছি। মড়া যখন আমাদের জিম্মা তখন মড়া আমাদের।'

'হ্যাঁ রে, তোদের জিম্মা হলে মড়া আমরা গাছালাম কি করে?' এবার সুধীর এল ফণা তুলে।

'তবে তোরাই তখন গেলি না কেনে। আমাদিকে ডেকেছিল, না, আমরা আপনা থেকে গেলছিলাম? কাঁধে করে এতটা পথ যে হেটে এলাম এ শুধু তামাসার জন্যে?'

'হা হে, তুমি তো খুব বুলছ।' কানিকুড় এগিয়ে এল: 'বলি এ কাদের গাঁয়ের মড়া? আমাদের গাঁয়ের মড়ায় আমাদের জোর বেশি না ভিন গাঁয়ের লোকের জোর বেশি?'

'আমাদের জোর বেশি।' বললে মাতুনগরের ছোকরা। 'কেননা এ মড়া আমাদের স্বত্বদখলী।'

'যা দেওয়ানিতে মামলা কর গা, ডিক্রি লে গা মড়া-পোড়ার। চল, তোল কাঁধে খাটুলি। মড়া আমরা গাছিয়েছি, এ মড়া আমাদের সম্পত্তি।'

পান্নু আর ভূপেন নাপিত আবার খাটুলি তুলল কাঁধের উপর। পিছনে মাতুনগরের ছোকরাদের উদ্দেশ করে বললে, 'ওপর-পড়া হয়ে যেমন গেলছিলি তেমনি এখন ফেন-চাটার মত পেছু-পেছু আয়—'

হঠাৎ মাতুনগরের এক ছোকরা চেঁচিয়ে উঠল: 'ও শালা-দিকে ঠেঙিয়ে মড়া কেড়ে লাও। জোর জুলুম নাই, যত সব

ভেড়ুয়া জুটেছে। ধারও নাই ভারও নাই— যত সব গোল গোবর ঢিপ। তোদের কোলের মাগ কেড়ে নিয়ে গেলেও ও-মুখে বাক্যি বেরুবে না। যত সব বাঁদীর বাচ্চা—' বলতে না বলতেই এক গাছা লাঠি তুলে নিয়ে ভূপেন নাপিতের পিঠে বসিয়ে দিলে।

মড়াশুদ্ধু খাটুলি ছিটকে পড়ে গেল রাস্তার ঢাল বেয়ে।

'তবে রে— আজ চরম হবে—'

'ঐ খাটুলিতে একা ঐ মড়াই শুধু যাবে না, আরো দু'একজনকে যেতে হবে।'

লেগে গেল লাঠালাঠি। উঠন্ত সূর্যের লালিমায় রক্তের ছোপ লাগল।

'ওরে, তোরা থাম, থাম। কার জন্যে লড়াই করছিস? মড়া কই?' অধর চেঁচিয়ে উঠল— এবার আর ভয়ে নয়, উল্লাসে।

সত্যিই তো, মড়া কই?

খাটুলি শুদ্ধু মড়া মুখ থুবড়ে পড়েছে রাস্তার পাশে। রাস্তার পাশে নালার মধ্যে।

বেশ জায়গায় পড়েছে। এখানেই থাক ও হতচ্ছাড়া। পাক-স্থলীর বামুন, ওর আর অন্য কোথায় জায়গা হবে? আহা, শেয়াল-শকুনের খোরাক হোক।

তবে মিছিমিছি আর মারামারি করে ফয়দা কি? যার

বিয়ে তার মনে নাই, পাড়াপড়শীর ঘুম নাই! মড়া রইল নালায় পড়ে, আর তোরা কিলোকিলি করে কাঁটাল পাকাচ্ছিস ?

সত্যি তো! কানিকুড়ে আর অধরে হাসিহাসি চোখ-তাকাতাকি হয়ে গেল। রতনে রতন চেনে। এসো বাপু, রফা-নিষ্পত্তি করে ফেলি। আপন শাক-বেগুন পরে খায়, পরের শাক-বেগুন তুলতে যায়। কী দরকার? বিরানা বিদেশীর জন্যে গাঁয়ে-গাঁয়ে ঝগড়া বাধানো? হ্যাঁ বাবা, বাড়লে চাষা বামুন মারে। উপায় নাই। আগে নিজের কাজ গুছোও, পরে পরের কাজ। তুমি কে-না-কে বামুন, তোমার জন্যে আমরা ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হতে পারব না। এরা-আমরা চিরকেলে বন্ধু পাতানো।

এ খুব সৎবুদ্ধির কথা। তোদের দিয়েছে কত? আশি? আমাদের দিয়েছে কুড়ি। আয়, সমান-সমান ভাগ করে ফেলি। তোদের গাঁ পঞ্চাশ আমাদের গাঁ পঞ্চাশ। ঘাটের ডোকলকে টাকা খাইয়ে লাভ নেই।

একবার কৃষ্ণানন্দে হরি হরি বল। হরিধ্বনি দিয়ে উঠল সবাই। লড়াই-ফ্যাসাদ বন্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে। টাকা ভাগ হয়ে গেল আধাআধি।

পাকা-কাঁচা কি মদ আছে সঙ্গে বের কর। একটা কেড়ামাতন জুড়ে দি। তুপদ গায়েন করি গলা ছেড়ে।

কিন্তু যাই বলো, একেবারে চলাচলের রাস্তার ধারে মড়াটাকে আরাম করতে দেয়া হবে না। তাতো বটেই, তাতো বটেই। ঐ তিরপুনির মাঠে নদীর একটা দ আছে, তারই গাবায় পুঁতে থুয়ে আসি। কোলগত করে রেখে আসি। তাই চলো পা চালিয়ে। শীতের সকালে কুয়াসার কম্বল গায়ে জড়পুঁটলি হয়ে আছে মাঠঘাট। রাস্তায় জন-প্রাণীর দেখা নাই কোথাও।

এই বেলা সেরে নাও চটপট। নইলে আবার আরেক রাত্রের আঁধারের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

দু গাঁয়ের লোক হাতে-হাতে হাত মিলিয়েছি। একের বোঝা দশের লড়ি। খাটুলিশুদ্ধ মরাটাকে নিয়ে চলল দুজন— দেবেশপুরের সুধীর আর মাতুনগরের দ্বিজপদ। দহের একটা বুনো-ঘাসে-ভরা নিরালা কোণ বেছে নিয়ে মড়াটাকে কাদার মধ্যে দাবিয়ে গুঁজে-পুঁতে দিলে। দশে মিলি করি কাজ, হারিজিতি নাই লাজ।

কি করবে বল। কপালের লিখন, গোপথে মরণ। খণ্ডাবার কেউ নাই। নইলে অমন আস্তমস্ত সোনার দেশ তাই বা খণ্ড-খণ্ড হয় কেন? উপায় নাই। অভাগার বৈকুণ্ঠে গেলেও সুখ হয় না। গঙ্গানদীর দেশে এসেও মজা বিলের জল খেতে হয়।

বেশ হয়েছে। যেমন বিয়ে তেমন বাজনা। সস্তা

করতে গিয়েছিলে পস্তাও এবার। আমাদের কি। যেমন কলি তেমনি চলি।

আগুন করে গোল হয়ে বসে হাত-পা সেঁকতে লাগল সবাই।

অধর বললে, 'আমাদের তবু একবার গঙ্গাতীরে যেতে হয়। কি বলো হে বেয়াই?'

'নিশ্চয়। তোমাদের তো ফিরে এসে পরতাল করতে হবে।' সায় দিলে কানিকুড়: 'কিছু সাক্ষীপ্রমাণ চেনা-চিহ্নৎ আনতে হবে বৈ কি।'

'আর তোমরা?'

'আমরা ফিরে যাব। গিয়ে বলব, মাতুনগরের দল মড়া নিয়ে বেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ— ধরতে পালাম না। কাগ হয়ে কাগের মাংস খাব না আমরা।'

'কেমন সুন্দর ফায়সালা হয়ে গেল বলো দিকিনি।'

'যার শেষ ভাল তার সব ভাল।'

কানিকুড়রা ফিরে চলল গাঁয়ের দিকে আর অধররা সাঁটুইয়ের পথ ধরল।

গঙ্গাধারের মাটির বাসন কিছু কিনলে— কলসী কুঁজো কলকে আর পাঁচচোরো, ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা করার ছোট জাঁতা, আর ভাবঘড়া। আর কান্দির বাজার থেকে মুড়িভাজা খোলা আর ঝাঁটার খিল আর ফুলকপি।

তিন দিনের মাথায় ফিরে এল দেবেশপুরে— রামহরি চাটুজ্জের বাড়িতে। পরতাল করতে।

পাশাপাশি বাড়িতে প্রমীলা কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করলে আর তাকে কাঁদতে দেখে তার ছেলেমেয়েরা।

'হাগো কেমন দাহন হল?' জিগগেস করল রামহরি।

'ওরে বাবা, মড়া ভারী কত! যেন পাষাণ চেপেছে!' হাঁপ ছাড়ার মত করে বললে দ্বিজপদ।

'এই বয়সে অনেক মড়া বয়েছি, কিন্তু এত ভারী মড়া কখনো বয়নি। একেবারে যেন নোহা, শিশের মতন ভারী, কাঁধ কেটে বসে গেলছে।' বললে খুতু মোড়ল।

'আর অমন পোড়াও কাওকে দেখিনি— ধন্যি পোড়া!' বললে অধর: 'একেবারে মাহাতাপের মতন আগুনের রং। জটাম করে এক জায়গা ফাটে আর কড়-কড় করে চর্বি বেরিয়ে দপ-দপ করে পাঁচ হাত খাড়াই হয়ে আগুন উঠে পড়ে। ঐ একবার কাঠ দিয়েই হয়েছে, আর নাগেনি।'

'তা অমন পুড়বে না কেনে?' দ্বিজপদ বুলি ঝাড়তে সুরু করল: 'দাদাঠাকুর সারাজন্ম দুধ ঘি খুব খেয়েছেন মনে হলচে— হাড় পেকে ঠিক হয়ে আছে— চর্বিও খুব। কাজে-কাজেই অমনি পুড়েছেন। সৎকার খুব ভালই হয়েছে। এত ভারি মড়া আমরা বলেই নিয়ে গেলছি, আর কোনো মামু হলে পারতে হত না।'

'কই নিজের গাঁয়ের নোক তো এল না—এল সেই ভেন্না গাঁয়ের মানুষ!' বললে অধর : 'আর এ শুধু এয়েছি বললে হল না, মরণ স্বীকার করে মড়া গঙ্গা দিয়েছি—'

মিষ্টি-জল খেল কাঠুরেরা। এবার দিনের দিন কাঠুরে ভোজন করাও।

কানিকুড়ের দল খাপ্পা হয়ে উঠল যখন শুনলে মাতুনগরের ওদেরকেই শুধু নেমন্তন্ন করেছে। সে কি কথা? মাতুনগরের ওরা এ নেমন্তন্ন নেয় কি করে? টাকা যখন ভাগাভাগি হল তখন ভোজও ভাগাভাগি করতে হবে।

সব বুঝে-সমঝে দামোদর ঠাণ্ডা করতে গেল। বললে, 'মালিকের চোখে আসলে মাতুনগরের ওরাই তো মড়া পুড়িয়েছে। ওরাই তো পরতাল করলে। তোরাও তো বলে গেলি চাটুজ্জে মশাইকে যে মাতুনগরের কেঁধোরা ঠিক লিয়ে গেলছে মড়া। এখন খাওয়া লিয়ে দাদ-বেদাদ করতে গেলে চাতরে হাঁড়ি-ভাঙা হয়ে যাবে।'

'হোক হাঁড়ি-ভাঙা। ভোজ আমরা ছাড়তে পারব না। ওরা যদি আমাদিকে ফেলে খায় তবে কুলের কথা সব ফাঁস করে দেব। যা হবে সব একসঙ্গে হবে। এক যাত্রায় পৃথক ফল ঘটতে দেবো না। কখনও না।'

'গাঁয়ে-ঘরে হলে পরেসপর উবকার করতে হয়—তা আমরা করি, করেছি। আমাদের গাছানো মড়ায় আমাদেরই

ষোল আনা ভাগ উচিত ছিল, তা ওদিকে দিছি আট আনা। আর আজ ভোজের আট আনা ওরা দেবে না? খিটকেল হয় তো হবে। চো, দেরি করিসনে, শালোদের দেখে লোব।'

মাতুনগরের কাঠুরেদের চিঁড়ে-ফলারের নেমন্তন্ন হয়েছে। চিঁড়ে, দই, গুড় আর সন্দেশ।

পাত পেড়ে কেবল বসেছে অধর আর তার সাকরেদরা, হৈ হৈ করে এসে পড়ল কানিকুড়ের দল। প্রায় লাঠি উঁচিয়ে।

'কিহে, হা হে, আমাদের ফেলে তোমরা একা-একা ফলার মারতে বসলে যে?'

'তা আমরা কি জানি। আমাদের লেমন্তন্ন করেছে আমরা খেতে এয়েছি।'

'তোমরা এই লেমন্তন্ন লাও কি বলে? তোমরা যদি কাঠুরে হও আমরাও কাঠুরে।'

'তোমরা কাঠুরে হও কি করে হে?' রামহরি এসে পড়ল।

বলার ভঙ্গি নকল করে ভূপেন নাপিত বললে, 'ওরা কি করে হল হে?'

'ওরা মড়া বয়েছে।' বললে রামহরি।

'আর মড়া আমরা গাছিয়েছি। আমাদের মড়া চুরি করে লিয়ে যত হামখোদাই। চোর মোঙলা কোথাকার!'

'চোর বলবি তো, চোয়াল চ্যাপটা করে দেব।' দ্বিজপদ লাফিয়ে উঠল।

'আহাহা,' বিবাদ করবার সময় এটা নয়।' রামহরি শান্তভাবে ব্যাপারটা মেটাতে চেষ্টা করল: 'মড়া আমি মাতুনগরের লোকদের হাতে গছিয়েছি, টাকাও দিয়েছি ওদেরকে। ওরাই মড়া বয়ে নিয়ে গিয়ে গঙ্গাতীরে দাহন করে এসেছে। আমার জানিত মত ওরাই মড়ার কাঠুরে।'

'আপনি যা জানেন আপনি ঠিকই করেছেন।' বললে কানিকুড়: 'কিন্তু ও শালোরা তো জানে আসল ঘটনা কি। তবে ওরা কোন সাহসে অধম্ম করে এসে ধম্মের ঘরের ভোজ খায়?'

'অধম্ম— অধম্ম কোথা রে হারামজাদা?' পাত ছেড়ে অধর ফের লাফিয়ে উঠল।

'অধম্ম লয়? পাক-স্থলীর সেই বাঙালকে তুরা পুড়িয়েছিস?' সুধীর এক আছাড়ে হাঁড়ি ভেঙে দিল: 'শালো, বাঁশচাপা, এখনো সেই নদীর দ-তে পাখমারার ডোবে গেলে বামুনের চেহ্নৎ মিলবে— শেয়ালে-শকুনে এখনো হয়তো সবটা সাবাড় করতে পারেনি। এই তোমার দাহন? এই দাহনের জোরে খ্যাঁট মারতে এয়েছ? শালো জায়জাতা, টাকা বাঁটতে পাল্লে, আর ভোজ বাঁটবে না? কাঠুরে সেজে একা-একা ফলার করে যাবে?—'

হৈ হৈ কাণ্ড, রৈ রৈ ব্যাপার। মারামারি, লাঠালাঠি পাত ছেঁড়াছিঁড়ি।

ভোজ-কাজ আর কিছু হল না। গাঁয়ের প্রধানরা এসে ঝগড়া-কাজিয়া মিট করে দিলে।

'হা বাপু, খাব না তো কেউ খাব না— আর যদি খাবই তু দলেই খাব। তোদের যেমন কীত্তিকম্ম, আমাদেরও তেমনি কীত্তিকম্ম—' তখনো বাই ঠুকছে সুধীর।

একজন প্রধান গলা নামিয়ে বললে, 'যা হয়ে গেলছে তা বয়ে গেলছে। ওরে মুখখু, আর সে-কথা তুলিসনে। ফৌজদারি হবে।'

দামোদর আরো গভীরে গেল। বললে, 'ওরে, গত কম্মের বিধি নাই। পরের লেগে আমাদের গাঁয়ে-গাঁয়ে কেন গণ্ডগোল হবে? কেন পরেসপরের বিরুদ্ধ হব?'

নতুন করে মৃত্যুশোক হয়েছিল প্রমীলার। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সে রামহরিকে ডেকে পাঠাল। জিগগেস করলে: 'এখন কী করব?'

মনে-মনে ভাবল কোথায় তাদের সেই বাড়ি-ঘর, নারকোল-শুপারির বাগান— আর কোথায় এই পাখমারার ডোব? কোথা থেকে কোথায়!

রামহরি মুখ নামিয়ে চুপ করে রইল। এক, পুলিশে খবর দেওয়া যেতে পারে। তাতেও হাঙ্গামা কম পড়বে না ওদের। কিছুই সুরাহা হবে না।

'এখন তবে কুশপুত্তলী দাহ করতে হয়।

পুরোত নেই আপনাদের গাঁয়ে? পুরোত ডাকুন—বিধি নিন—'

এর পর আবার পুরোত! পুরোতরা তো কাঠুরেদের চেয়েও বেশি চশমখোর। কাৎ হয়ে শুয়ে মরেছে, না, চিৎ হয়ে শুয়ে মরেছে— তার উপরে পয়সা নেবে। কি বার, কেমন সময়, কোন শিয়রে শুয়েছিল— সবার উপরে হিসেব!

'আপনি মিছিমিছি উতলা হচ্ছেন। ওরা ঠিকই আপনার স্বামীকে গঙ্গাতীরে দাহন করেছে। শুধু ভোজ খাওয়া নিয়ে ঝগড়া বাধাবার জন্যে অমনি এক আজগুবি গল্প ফেঁদেছে। এমনিতরো হামেসাই হয় আমাদের গাঁয়ে-ঘরে। শুধু ঝগড়া বাধানোর জন্যে কেচ্ছা বানানো।'

'আপনি বলছেন গঙ্গাতীরে আমার স্বামীর দাহন হয়েছে?'

'হ্যাঁ, বলছি বৈ কি। দাহন না হলে মাতুনগরের ওরা কাঠুরে সেজে ভোজ খেতে আসবে কেন?'

বিশ্বাস করতে বড় ইচ্ছা হল প্রমীলার। ম্লানকণ্ঠে বললে, 'কিন্তু সুধীর নামে ঐ ছোকরাকে ডেকে আমি কটা টাকা দিয়েছি।'

'কেন? ভোজ খেতে?'

'না। ঐ পাখমারা ডোব থেকে আমার স্বামীর— যদি খুঁজে-পেতে পায়— এক-আধটা অস্থি আনবার জন্যে।'

'হয়তো কোনো জন্তু জানোয়ারের হাড় নিয়ে আসবে।'

'আনুক। তবু বিশ্বাস করে তাই আমি নিজের হাতে করে গঙ্গায় গিয়ে ফেলে আসব।'

রামহরি মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল প্রমীলার দিকে।

প্রমীলার দু-চোখ কান্নার ভরে গেল : 'উনি যদি এতটা বিশ্বাস করতে পারেন, আমি কি তবে সামান্য এই এতটুকু করতে পারব না ?'

মুলতুবি

সাক্ষী মানা হয়ে গিয়েছে। এবার সমন ধরাতে হবে।

হ্যাঁ, বারবরদারি পাবে বৈ কি। আজুরি-মজুরি যা চাই। টপ্পর-দেওয়া গরুর গাড়িতে করে নিয়ে যাব।

দর দাম ভালো দেবে তো? দেখো— বললে কপালী কাহার।

ত্যাশের কণ্টকে পরাণ গেল। কাপড়ের কণ্টক, ত্যালের কণ্টক। তোরা আবার সাক্ষীর কণ্টক লাগালি?

উপায় কি! খাদ্যখরচ বেড়ে গেছে কত আজকাল। সেদিকটা তো খেয়াল করবে?

তা কি বুঝি না? খুব বুঝি। তা, ক্ষতি খেসারৎ সব মিটিয়ে দেব। একদিনের তো মামলা। যাবি আর আসবি। ছুটো মুনিষ তোরা, দিয়ে দেব তোদের দিনের মজুরি।

শুধু এই? কপালী মুখখানা এক ফুঁয়ে নিবিয়ে ফেললে। বললে, এ আর বেশি বলছ কি। শুধু খোরাকি-মজুরি হলে

চলে ? ও তো এখানেও চলছিল। বাড়তি রোজকার চাই। বুঝলে ? সবাই আজকাল বাড়তি রোজকারের ফিকির খুঁজছে।

কি বাড়তি রোজকার চাই বল।

ঐ যাকে বলে উপরি পাওনা। আমরা ছোট-লোক, ঘুস বলতে পাব না তো, বলো ফাউ। যে দিন-সময় পড়েছে, উপরের দিকে কেউ চায় না, সবাই উপরি চায়।

ধর্মকথা শোনাতে হবে না তোকে। কি চাস তাই বল ? ধান চাস ? খড় চাস ? গাঁতায় চাষ করে দেব একদিন ? নয় তো বেগার দেব লাঙ্গল-বলদ ?

ও সব কিছু নয়। নগদ টাকা চাই। তুতিয়ে-তাতিয়ে সাক্ষী পটাবার দিন আর নেই হে কত্তা। সব এখন পয়সার ভানুমতী।

তাই দেব যা পারি। সখানাথ মরিয়ার মত বলে ফেললে। পয়সার ঝাঁজে গলায় তেজ ফুটল, কিন্তু খাঁটি সত্য কথা বলবি। জোচ্চুরি ফন্দি কিছু নেই— সব দেখা সাক্ষী, শোনা সাক্ষী নয়—

দোরে দোরে সাক্ষীর তাগাদায় ঘুরছে সখানাথ।

বাকি খাজনায় পড়ে গেছি হে। তুমি যাবে আমার পক্ষে সাক্ষী দিতে ?

তা যাব বৈ কি। গোষ্ঠ কুনাই এক কথাতেই রাজি।

খাজনার দায়ে কে না পড়ে? বিষয়টা কি? টাকা শোধ করে দিয়েছ? রসিদ দেয়নি? নজর নিয়ে ঝামেলা হয়েছে? তা একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে দিও আগে থেকে— শেষে না ফেরে পড়ে যাই—

ও সব কিছু নয়। মিথ্যে সাক্ষীর তদবিরে বেরোইনি। খুলে-খেলে সত্যি কথা বলবে। স্পষ্ট সত্য কথা।

তা হলে কি জিততে পারবে মামলা? অনেক অভিজ্ঞতায় ঠাণ্ডা, শক্ত গলায় জিগগেস করলে গোষ্ঠ।

বলে কী গোষ্ঠ? এর মধ্যে বানানো-বাড়ানোর আছে কি? ও তো চোখের উপর স্পষ্ট দেখা যায়। শোনা যায় কান পেতে!

সূর্য যে দিনে উঠে দিনে ডোবে তা আবার বাড়িয়ে-বানিয়ে বলতে হবে নাকি? এ তো একেবারে জ্বলজ্যান্ত সত্য।

বিষয়টা কি তাই বলো না। গোষ্ঠ জাল বুনছিল, জাল বুনতে লাগল।

'বিষয় আবার কি!' সখানাথের অস্থির লাগছিল এও আবার সবাইকে বিতং করে বুঝিয়ে বলতে হয়! 'মাঠের জমির খাজনার কমি পাব না আমি?'

'কেন মুনিব বেদখল করেছে নাকি পাশ থেকে? আরেক প্রজার জমায় এ জমির খানিক ভরে দিয়েছে নাকি?'

ও সব প্যাঁচালো-ঘোরালো কিছু নয়। একেবারে জট-

ছাড়ানো সুতোর মতো সোজা। সখানাথ দাবার উপর উঠে এল। বসল গোষ্ঠের পাশ ঘেঁসে। বললে, 'মহুয়ার মাঠে আমার সেই জমি দেখেছ তো? আঠারো টাকা সাড়ে তেরো আনার সামিল। তেরো চৌদ্দ পোর ডাক। দেখনি?'

তা আর দেখিনি? কিন্তু সে জমি আর কই? অদ্ধেকের বেশিই তো প্রায় নদীগর্ভে।

'তাই বলো কেনে।' মাটির উপর চাপড় মারল সখানাথ। 'তাই বলো তোমরা একবার। নদীর দয়া হল--- জমি এখন ঠেকেছে এসে বড়জোর বিঘেখানেকে।'

'এ তো চোখের উপব স্পষ্ট লেখা আছে হে। এর আবার সাক্ষী গুজরানো কি?' জাল বোনা বন্ধ করে এক নজর উঁচু চোখে তাকাল গোষ্ঠ কুনাই।

'তবে বলো তোমরা একবার! এ কেমন ধারা জবরদস্তি!' সখানাথ ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়াল দাবার উপর। 'জমিদার এখনো গুজস্তা জমির খাজনা চায়। বললাম, নদীতে জমির কমি হয়েছে খাজনা কমি করে নাও। শোনে না, পুরো খাজনার দায়ে চার বছরের নালিশ ঠুকলে।'

এ অসম্ভব ব্যাপার। এ হতেই পারে না। জমি নেই তো খাজনা! ঘোড়া নেই তো চাবুকের ধুম।

একেবারে দেব না তো বলিনি। যতটা খেয়েছে বাদ দিয়ে বাকি জমির জন্যে হারাহারি খাজনা নাও। তা শোনে না

গোমস্তা। বলে যেমন খেয়েছে তেমনি আবার ভরে দিয়েছে। ভরে দিয়েছে তো বালি দিয়ে, বালির ঢিপ দিয়ে। যাকে বলে 'বালিমুদ্রা' হয়ে গিয়েছে। তা যাই হোক, জমির বুঝ পেয়েছিস তো ?— বলে ঐ গোমস্তা— এক ঘেরের মধ্যে পেয়ে গেছিস তো ষোল আনা! একবার বেআকলেপনাটা দেখ! সবুজ মাটি শাদা ভস্ম হয়ে গেল, বলে কিনা সাবেক জমি নিখুঁত আছে, নিটুট আছে ঘেরচৌহদ্দি। কিন্তু আমার ধান কই? আমার সেই উথল মাঠের ধান? ঠেটা গোমস্তা তারপর কি বলে জানো? বলে, বালিতে ধান হয় না, কিন্তু কাঁকুড়-করলা তো পেয়েছিস! শোন কথা। কটা পুঁটলে উচ্ছে আর কটা খোঁড়কাঁকুড়। ওরা কি আমার ধানের সমান?

বললাম, আমি ধানী জমির পত্তন নিয়েছিলাম, আমি ধানী জমির বুঝ চাই। মোট পরিমাণ বা ঘের-চৌহদ্দি দিয়ে আমার কী হবে? আমার ধানী জমির কমতি পুরিয়ে দাও খাজনা মকুব দিয়ে। জমির শক্তি কমেছে, আমার খাজনার শক্তি কমবে না? যেমন জমি তেমন কমি।

'তা বলে কি গোমস্তা?' গোষ্ঠ একমনে জালের ফাঁস তোলে।

'বলে, যেমনি জমি তেমনি আছে। তুই মেপে লে গা। বালি কি কালি তা জানি না আমরা— তোর চার চৌহদ্দি বহাল আছে।'

'আর নদী ?' খরচি চালানো বন্ধ করে গোষ্ঠ চোখ তুললো, 'মাঠ খেয়ে-খেয়ে যে বালি উগরোলো এক বচ্ছর ?'

'বলে, কোথায় নদী ?'

কোথায় নদী ! এ কি অসম্ভব কথা ।

'এরি জন্যই তো সাক্ষী দিতে ডাকা তোমাকে ।' সখানাথ বসা অবস্থায়ই এগিয়ে এল দুপা । 'বলে কোথায় নদী ! আজ দশ বচ্ছর ধরে ভেঙে ভেঙে খেয়ে খেয়ে আসছে । কত প্রজা ঘর-বসত ছেড়ে উঠে গেল ভিন্ন গাঁয়ে, কতজনে ইস্তফা দিলে দলিল লিখে । বেলে জমি বন্দোবস্ত হল কত । আজ বলে কিনা, নদী চিনি না । নদী কোথায় !'

'এ গাঁ শুদ্ধ সকলে জানে । এর আবার সাক্ষী-প্রমাণ কি !'

'সেই কথাই বলো কেনে । একেবারে মূল ধরে টানছে । দিব্যি দিনের আলো রয়েছে, বলে সূয্যি কোথায় ? চোখের সামনে বালির পাহাড়, বলে, নদী কোথায় ? তা সাক্ষী দিতে যাবে তো ?'

খরচি-টিপনে নিয়ে গড়িমসি করতে করতে গোষ্ঠ বললে, 'তা যেতে আপত্তি কি ! কিন্তু—'

বুঝেছি এও ঘুস চায় । খরখরে জিভে সত্যকথা বলতে জিভে ব্যথা লাগবে । মধু চাই ।

'ঘুস কেনে বলছিস ?' কথাটা যে শুনতে ভাল নয় তা

গোষ্ঠ জানে। তাই সে আপত্তি করে উঠল। বললে, 'বল বকশিস। আগে দিলে ঘুস পরে দিলে বকশিস। তুই পরেই না-হয় দিস।'

কি চাস ?

'ঘর ছাওয়াতে হবে এবছর। খড়-দড়ি আমি দেব, তুই শুধু মুনিষ পাটের খরচটা দিয়ে দিবি—'

'দেব, তাই দেব।'

'অত চটছিস কেনে ? চটবার কী হয়েছে ! জ্ঞাত-কুটুম তো নই আমরা। ফারাক সাক্ষী ধরতে হলে একটু কিছু দিতেই হবে এদিক-ওদিক। দিতে না চাস, কুটুমবাড়ি যা, শালা-সুমুন্দি সাক্ষী ধর গে। সে সাক্ষীর দাম নেই কানাকড়ি।'

'না, চটলাম কোথায় !' সখানাথ বসা পায়ে হেঁটে-হেঁটে আরো একটু এগিয়ে এল। 'বললামই তো দেব।'

'ও মুখের কথায় হবে না। ঘাস ছুঁয়ে বল।'

বড় কঠিন প্রতিজ্ঞা। যাকে বলে, ছুতি। ঘাস ছোঁয়া মানে দেবতা ছোঁয়া।

দাবা থেকে নেমে পড়ে সখানাথ ঘাস ছিঁড়ল একটা। বললে, দেব তোমার ঘর ছেয়ে। এই ঘাস ছুঁয়ে বলছি।

জমিদারের হালসাহানা এসেছিল তলবতাগাদায়। তার হাত দুটো চেপে ধরেছিল সখানাথ। বলেছিল, 'পুরো

আঠারো টাকা সাড়ে তেরো আনাই তাগাদা করছ? চোখ ছুঁয়ে বলো তো, সেই সাবেক জমি আর আছে? নদীতে খেয়ে নেয়নি?'

'নিয়েছে তো নিয়েছে। তার আমি জানি কি! আমি সাতেও নেই পাঁচেও নেই। তলবতাগাদায় পাঠিয়েছে, তলবতাগাদা করে যাব।'

'কিন্তু আঠারো টাকা সাড়ে তেরো আনা চাইবে কেন? নদীতে যখন আদ্ধেকেরো বেশি টেনে নিয়েছে তখন হিসেব করে খাজনা বাদ দিয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে তাগাদা কর।'

হালসাহানা বেতালার মতো দাঁড়িয়ে ছিল। বলেছিল, নদীর কথা নদী জানে। আমার কাজ আমি বুঝি। এর মধ্যে হিসেবই বা কি, নিকেশই বা কোথায়।

'সোজা কথার সোজা হিসেব তোরা বুঝবি না?' সখানাথ কান্নাহীন গলায় বললে, 'ও বছর আমার যে দু-দুটো উঠন্ত ছেলে জ্বর-অতিসারে মরে গেল তারপর থেকে আমার সংসারে দু বাটি চাল কম লাগছে না?'

কঠিন উপমা দিয়ে বোঝাতে হয়েছিল হালসাহানাকে। সে বলেছিল, 'অত হিসাব কিতাবের আমি ধার ধারি না। আমার বুদ্ধির ডগা অত সরু নয়। গোমস্তাকে ধরো গে।'

গোমস্তাকেই ধরেছিল তারপর। কান্নাহারা কঠিন উপমাটাই প্রয়োগ করেছিল শেষ পর্যন্ত।

মাঝখানে একটু নরম পড়েছিল গোমস্তা। বলেছিল 'তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু নদীতে কতটা ভেঙেছে তা মাপ না হলে খাজনা ঠিক হবে কি করে?'

খুশিতে লাফিয়ে উঠেছিল সখানাথ। 'তা মাপ করে দেখুন কেনে একবার। আপনাদের আমিন আছে বদর-আমিন আছে, শিকলজরিপ করে দেখুন কেনে কতটা জমি আমি দখল করছি। যা হিসেবে দাঁড়ায় দিয়ে দেব একমুষ্টে।'

'আমাদের মাপ করার কী দরকার!'

'দরকার নেই?'

'কিছু না। সেরেস্তায় জমা দেখছি আঠারো টাকা সাড়ে তেরো আনা। খারিজ নেই ইস্তফা নেই ফৌতফেরার নেই—চার বছর সালিয়ানা বাকি। নালিশ ঠুকে ষোল আনা আদায় করাই আমাদের কাজ—'

'যেখানে আসলে পাওনা আপনাদের চার আনা সেখানে গলায় পা দিয়ে পুরো ষোল আনা আদায় করে নেবেন?'

'সরজমিন তদন্ত করা গা। দেখা না চার আনা না চার পয়সা আমাদের পাওনা।'

'খাজনা পাবেন আপনারা আর মাপ জরিপ করব আমি?' সখানাথের ভোঁ লেগে গিয়েছিল।

'হ্যাঁ, এই আইন।'

'আইন না কাঁচকলা।' হঠাৎ মুহূর্তের জন্যে তেরিয়া হয়ে উঠেছিল সখানাথ। ঐ মুহূর্তের জন্যেই।

পরক্ষণেই পা জড়িয়ে ধরেছিল গোমস্তার। বলেছিল, 'আমি মুরুখখু চাষা, আমার মাথা মুরুব্বি কেউ নেই। আমি আইন আদালতের কি বুঝি? মাপ জোক লাগবে না, কতকশতক কম করে নিয়ে একটা কিছু ধরে দিন যা ন্যায্য হয়—'

আইনের অমর্যাদা করেছে, গোমস্তা মুখ ফিরিয়ে রইল। কতক্ষণ পরে হঠাৎ ঝামটা মেরে বললে, 'কোথায় নদী! মেপে ছ্যাখ গা তোর যেমন জমি তেমনি আছে।'

যখন জবাব দিতে আদালতে উকিল ধরতে গিয়েছিল সখানাথ, সেও তখন বলেছিল সরজমিন তদন্ত করিয়ে কমি দেখাতে না পারলে খাজনার মকুব মিলবে না।

থ হয়ে গিয়েছিল সখানাথ। যে খাজনা পাবে সে তদন্ত করিয়ে দেখাবে না যে তার ষোল আনা জমিই নিটুট আছে। যে খাজনা দেবে তাকেই দেখাতে হবে জমি কতটা আছে বর্তমান!

হ্যাঁ, এই আইন।

নইলে তো প্রত্যেক বাকি খাজনার মামলায়ই দুষ্টু প্রজা এসে বলবে জমি কমি হয়েছে। বেশ তো, কমি হয়েছে, মাপজোক করে প্রমাণ করো। প্রমাণ করে মিনাহা নাও।

কথাটা শুনতে ঠিকই শোনাচ্ছে। তবু নদীতে যেখানে নস্যাৎ করেছে সেখানে সোজাসুজি সস্তা কোনো প্রতিকার নেই এই বা কেমন ধারা আইনকানুন!

জমা তবে ইস্তাফা দিয়ে দে।

তিন টুকরো জমি নিয়ে জমা, এক লপ্ত তো নয়। দক্ষিণের বন্দে বাস্তু, পাশের দাগে বাগান, গাছগাছালি। ধান জমিটাই নদীর ধারে গিয়ে পড়েছে।

বাড়িঘরও ছাড়তে হয়। বাড়িঘর ছেড়ে যাই কোথায়? হাঁটি কোন পথ দিয়ে?

তা হলে সরজমিন তদন্তের দরখাস্ত কর।

কত খরচ পড়বে?

আদালত থেকে পাশ-করা উকিল-আমিন যাবে। সাধ সম্মান রাখতে হবে পুরোপুরি। মেরে কেটে শ'খানেক টাকা তো বটেই। উপায় নেই, কড়ি বিনে হরি মেলে না।

এক'শ টাকা! অসম্ভব। এত টাকা পাব কোথায়?

'তবে যে করে হোক মৌখিক সাক্ষী দিয়েই না হয়—' উকিল আশ্বাস দিল। 'কিছু ভাবিসনে। নদীর লাগোয়া যে সব সাক্ষী আছে, গ্রামসুবাদের ভাই ভায়াদ কেউ নয়, এমনি গোটা কয় আলগা সাক্ষী ধরে নিয়ে আয়, টানা হেঁছা করে যা পারি কমিয়ে নেব জোর করে।'

তাই সেই সাক্ষীর তালাসে ঘুরছে সখানাথ।

মুলতুবি

নদীর ওপারে কেদার হাজরার বাসঘর। বয়েস হয়েছে, সকলেই মানে গোনে। সালিশ-বৈঠকে আড্ডায়-মজলিশে সকলের আগের ডাক, আগের জায়গা। সম্প্রতি নাকে কানে হাতে পায়ে কুড় বেরিয়েছে বলে একটু কাহিল হয়ে পড়েছে। সমাজে সে নিজে আর না বিকুলেও তার কথা বিকুচ্ছে তেমনি।

'আমি চিররুগী, মহারুগী, আমাকে কেন?' কেদার হাজরা আপত্তি করল।

'গো-গাড়িতে করে নিয়ে যাব। কাঠগড়ায় আপনি একবার উঠে দাঁড়ালে মনে হবে স্বয়ং ধর্মরাজ উঠে দাঁড়িয়েছেন।'

খুশিতে কেদারের মুখ আরো ফুলো ফুলো দেখাল। তাকে ধর্মরাজ বলে তোষামোদ করার জন্যে নয়, সে যে শহরে গিয়ে ভদ্র ও সুস্থ একটা জনতার মাঝে দাঁড়াতে পারবে তার জন্যে। যে কুষ্ঠরুগী, তার কাছে এর মত আর সুখের কল্পনা নেই। সকলের সঙ্গে মেশবার একটু সুযোগ পাওয়া। সকলের মাঝখানে ভিড়ে-দঙ্গলে হঠাৎ এক ফাঁকে ঢুকে দাঁড়ানো।

আর, এ তো আদালতের সাক্ষী। মানিত সাক্ষী। সমনধরানো সাক্ষী। কাঠগড়া থেকে নামায় কে। কে দূরদূর করে।

'যাব তো বলছিস, কিন্তু রোদ্দুরে বড় কষ্ট হয়। আর এখন এই আম পাকানো রোদ— দুপুর বেলা ঘা গুলো বড্ড চচ্চড় করে। নইলে আদালতে যাব সাক্ষী হয়ে সে তো সুখের কথা।'

'কিছু ভাবনা নেই। যে দিন তারিখ পড়েছে মোকদ্দমার, সে দিন ধর্মরাজের পূজো। নইলে সাধে কি তোমাকে ধর্মরাজ বলি?' সখানাথ হাসতে লাগল।

তার মানে? সে দিন আদালত বন্ধ।

বন্ধ নয়, সে দিন আদালত দুপুরে না ব'সে সকালে বসে।

এই চলে আসছে দেশাচার। প্রতি বছরে ঐ এক দিন শুধু সকালের কাচারি।

এ অঞ্চলে ধর্মরাজের পূজো খুব বড় পূজো। বিস্তর ধুমধাম। বহু লোক ভক্ত সাজে, উপোস করে। দুপুরে ধর্মরাজ ভক্তদের কাঁধে চড়ে গ্রাম গ্রামান্তর ঘুরে বেড়ায়। হোম হয়, কীর্তন হয়, মেলা বসে বারোয়ারীতলায়। উত্তম অধম সকলের দেবতা। সকলের ঘরে শমনের সমান সমন-জারি।

'তা সকালে হলে যেতে পারব ঠিক। খনার মতে উষা-যাত্রা। ফল ভালো হবে নিশ্চয়। মামলার দিন তোর ভাল পড়েছে।' তৃপ্তিতে হুঁকো খেতে লাগল কেদার।

'কিন্তু সাক্ষী কি বলবেন তা জানেন তো ?' বড় সমীহ করে জিগগেস করল সখানাথ।

'এইটুকু রোগা পাতলা ছিপছিপে ছুঁড়ির মত দেখেছিলাম প্রথম নদীকে, একটু বা ফাজিল একটু বা ডানপিটে। ক্রেমে ক্রেমে কি হয়ে দাঁড়াল নদী— বেহায়া, ছিনাল, ঢেমনি। যাকে ধরে তাকেই ফতুর করে। ফলা মাঠ অফলা করে দেয়। শস্যলক্ষ্মীকে তাড়িয়ে দিয়ে নিয়ে আসে বাজা ডাঙার ফাঁকি। বলব, বলব, নদীর কলঙ্ক-কথা বলব আমি আদালতে। সব চোখের সামনে দেখা আমার।'

তার চেয়ে জমিদারের কলঙ্ক বেশি। আমতা আমতা করে জিগগেস করল সখানাথ, 'সাক্ষী দেয়ার দরুন কিছু লাগবে আপনাকে ?'

'তুই পাগল হয়েছিস ? ধর্মরাজের পূজোর দিন ধর্মাবতারের এজলাসে দাঁড়িয়ে ডাহা সত্য কথা বলব এর মত ধর্মকাজ আর কি আছে ? তুই যে সাক্ষী মেনেছিস, নিয়ে যাচ্ছিস দশজনের দরবারে সেই আমার বেশি।'

কিন্তু নিভরস সেখের অন্যরকম চেহারা।

বলে, কিসের সাক্ষী, কিসের মোকদ্দমা! ঢের সয়েছি আমরা, আর সইব না। কিছুতেই না। আর নেবনা ঘাড় পেতে। দেবনা ঘাড় বাড়িয়ে। ঘাড় এবার আঁট করব।

বলে কি নিভরস ? কি করবি তুই শুনি ?

খাজনা দেব না। খোদা দানার মালিক, দিতে হলে খোদাকে খাজনা দেব। সে খাজনা আমার শরীরের মেহনৎ, আমার ধর্মের খাটুনি। জমিদারকে চিনি না। কে জমিদার ? তাকে কেন খাজনা দেব ?

এ বলে কি বিপরীত কথা! কিন্তু খাজনার মামলা বসালে করবি কি জিগগেস করি ?

করুক মোকদ্দমা। জবাব দেবনা, হাজির হবনা আদালতে। কিল খেয়ে উকিল পুষব না! করুক ডিক্রি। ডিক্রি জারিতে দিক। নিলাম করুক। তারপর বাছাধন আসুক একবার দখল নিতে। এতক্ষণ কাগজে কলমে চলছিল এবার হাতে-হেতেরে। দেবনা দখল। তোর বেলায় আমি, আমার বেলায় তুই, সব একজোট হয়ে বাধা দেব, রুখে দাঁড়াব। তবু জোরজবরদস্তি করে দখল নেয় নিক, জমি কেউ বন্দোবস্ত নেব না। তোর জমি আমার কাছে হারাম, আমার জমি তোর কাছে গরু। জমিদার জমি খাসে রাখতে চায়, কেউ যাবনা কিরষানি দিতে, মুনিষ খাটতে। বিদেশ থেকে মুনিষ আনতে চায়, দাঙ্গা বেধে যাবে। স্বদেশ বিদেশ সব এক নিয়ম হয়ে যাবে— সব এক খেয়ার জল। কেউ আসবেনা পরের জমিতে হামি হতে। খাসে এনে সব জমি পতিত রাখতে হবে জমিদারকে। শুনছিস ? জমি পতিত রাখার মানেই নিজে পতিত হয়ে

যাওয়া, জাত খোয়ান। তার মানে, তোর জমি তোর হেপাতেই থাকবে, তোরই লাঙ্গলে-দখলে। বলে, একা না বোকা, আর একসাথ না জগৎমাৎ।

ক্লান্তের মত চোখ বুজল সখানাথ। গা থেকে খুলে ফেলা কুর্তাটা দিয়ে হাওয়া করতে লাগল।

কনুই ধরে ঠেলা দিল নিভরস। জমিদারি যে উঠে যাচ্ছে দেশ থেকে খবর রাখিস?

ঝিমনি থেকে সখানাথ চমকে উঠল। উঠে যাচ্ছে? সত্যি?

'গবর্নমেণ্ট কিনে নিচ্ছে সব জমিদারি। আর জানিস তো'; ঝিমন্ত সখানাথকে আরেকটা ঠেলা মারল নিভরস: 'দিন দুই পরে আমরাই সেই গবর্নমেণ্ট। হ্যাঁ করে আছিস কি উজবুকের মত? হ্যাঁ, আমরাই গবর্নমেণ্ট। এইসব চাষাভুষো, মুনিষ কৃষান, মুটে-মজুর— আমরাই আমাদের মালিক-মুনিব, আমরাই আমাদের জমিদার। হিঁদু-মুসলমান বলে কেউ নেই— সব এক খেয়ার জল, এক মাঠের ধান···'

দিন-দুপুরে নিভরস নেশা করেছে নাকি? গাছের ছায়ায় বসে কই একটু সুখ-দুঃখের কথা কইবে, তা না, যত আষাঢ়ে গল্প। বাজে কথা!

'কেন, দেশ যে স্বাধীন হয়েছে শুনিসনি বুঝি?'

ঝাপসা ঝাপসা শুনেছে বৈ কি সখানাথ। একদিন দেখেছে বাবুদের অনেক লাফালাফি, অনেক তর্জন-গর্জন। ব্যাপারটা বোঝেনি কিছু ভালো করে। কোন খেলায়-টেলায় জিতেছে বুঝি বাবুরা এমনি ভেবে নিয়েছিল। বাবুদের ফুর্তি, তা তাদের কি?

'প্রথম খেলাটা বাবুরাই জিতল। শেষের খেলাটা আমরা জিতব।' নিভরস সেখ গম্ভীর মুখে বললে, 'আগে বিলিতি সাহেব তাড়াল বাবুরা, এবার দিশি সাহেব তাড়াব আমরা। জমিদার মহাজন—'

আবার ঝিমুতে লাগল সখানাথ।

'কিন্তু যদ্দিন তা না হয়, আমার মামলার কি হবে?' ধাক্কা খেতে না খেতেই কথা ছিটকে এল মুখের থেকে: 'সাক্ষী দিবি তো?'

'শোন, খাঁটি কথা বলি, সাক্ষী-টাক্ষীতে কিছু হবে না। নদীতে জমি ভেঙেছে এ মোটা কথা বিশ্বাস করাতে পারলেও আসান পাবি না। আদালতে কতটা ভেঙেছে কতটা আছে তার ঠিকঠাক নক্‌সা জরিপ চাই। আমি ভুক্তভোগী আমি জানি। নিজের খরচে সরজমিন তদন্ত করিয়ে নিতে হবে। মুখের কথায় কি জমির মাপ হয়?'

'বা, উকিল যে বললে মৌখিক সাক্ষীতেই ফল হবে—' সখানাথ চেঁচিয়ে উঠল।

'বলেছে নাকি ? তোর অবস্থায় কুলুবে না বলেই হয়ত বলেছে। আর উকিলে কি না কয় !'

সরজমিন তদন্ত করারই চেষ্টা দেখুক সখানাথ। কাজটা পাকাপাকি করে নেয়াই ভালো। আন্দাজী কথায় আদালতের হিসেব হয় না।

কিন্তু হাওলাত কর্জ কে দেবে ? একশ' টাকা তো সোজা নয়। পাঁচ কুড়ি। যা কিনা সখানাথ গুনতে পর্যন্ত পারে না।

খতে তমশুকে হ্যাণ্ডনোটে দস্তাবেজে ধার দেবে না কেউ। টাকা চাই তো খাড়া কবালা করো।

আর একটা ছোট জমা আছে সখানাথের। নদীর কূল থেকে সরে এসে। ডাকস্থুরৎ বিঘে তিনেক হবে। বন্দ আছে পাঁচটা। সবচেয়ে যেটা ছোট সেটা সাত কাঠা। মাঠের আজকাল বাজার খুব চড়া, ঐ সাত কাঠার দাম কমপক্ষে দু'শ টাকা। বেশ তো, বেচতেই যদি হয় ঐ সাতকাঠাখানাই বেচবে। দু'শ না পাই দেড়'শ তো পাব। এ তোমার বেলে জমি নয়, মেটেল জমি।

মহাজন অঘোর কবরেজ। নরুনে কবরেজ। নাড়ী টেপে আর সুদ মারে। আর সে কি সুদ ! সে সুদের আগে ঘোড়া পর্যন্ত দৌড়ুতে পারে না। কাগজের টাকায় বালিশ ভরে,

তোষক বানায়। লোকে বলে তার কুঁড়াজালিতেও নাকি গিনির চাকতি।

এক ডাকে যখন-তখন টাকা বের করতে অঘোর ছাড়া আর কেউ নেই। অন্য খদ্দের ধরতে চাও তো, অনেক বলা-চলা লাগবে, অনেক হবে-হচ্ছে। অঘোরের কাছে তুন্নু-মুন্নু নেই, খিরিস-মিরিস নেই— ফেল কড়ি মাখ তেল।

অঘোর এক কথাতেই রাজি। কিন্তু টুকরো ফালি নয়, গোটা আস্ত জমাটাই ধরে দিতে হবে। দরও তেমনি আস্ত পাবি।

সে কি আকার! সখানাথ ছটফট করে উঠল: আমার টাকার দরকার একশ-দু'শ, আমি গোটা জমি বেচতে যাব কেনে?

তোর দরকারেই তো সংসার চলবে না। যার হাতে টাকা তারই মর্জিতে আর্জি পড়বে। অঘোর কবরেজ নাকের গর্তে নস্যি টিপল: পুতুল নাচে দড়ির টানে। যার হাতে কড়ি তারই হাতে দড়ি, বুঝলি?

সখানাথ ঢোঁক গিলল। বললে, 'সমস্ত জমি বেচে দিয়ে আমি শেষে ফ্যা ফ্যা করে মরব? আপনি তাই চান?'

অঘোর বললে, 'আমি চাইব কেন? ভগবান চান।

ভগবান তাই তোকে মামলায় ফেলেছেন। ভগার মার দুনিয়ার বার।'

'মামলায় ফেলেছেন ফেলুন। তিনিই আবার বেরিয়ে আসবার পথ করে দেবেন। সাতকাঠার বন্দটা বেচতে পারলেই এ যাত্রা আমি রেহাই পাই।'

সাতকাঠা! মামলার দায়ে লোকে সর্বস্বান্ত হয়। ঐ মহাব্যাধির মতই মামলা। খসে খসে পচে পচে পড়ে। এখনি কি!

সখানাথ অনড় চোখে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। বললে, আংশিক জমি তাহলে নেবেন না?

'আংশিক জমি নিলে অনেক ফ্যাচাং। খারিজ কর, মালেকের সেরেস্তায় ধন্না দাও। আমাকে দেখলে তো মালেক খারিজে রাজিই হবেনা। ভাববে, মোটা লোক পেয়েছি, এবার গোটা জমির খাজনা এক থাবায় এরই কাছ থেকে তশিল করব। লাভের মধ্যে হবে এই, বেদের রোজগার বাঁদরে খাবে।'

'তা কেন?' সখানাথ লাফিয়ে উঠল: 'আমারা আপোষে ভাগ বণ্টন করে নেব। হারাহারি সরিকি খাজনা একত্র করে দিয়ে দেব ষোল আনা।'

আঘোর হাসল। বললে, 'বিশ্বাস কি। এখন অংশ বেচতে এসেছ, খুব ভদ্দরলোক সাজছ, যেই অংশ একবার

বসাবে ঘাড়ের উপর অমনি যে ছোটলোক সে ছোটলোকই হয়ে যাবে। নিজের অংশটুকুও উশুল দেবেনা। তখন এই বড় গাছেই ঝড় লাগবে সব। তা ছাড়া—'

কান খাড়া করে রইল সখানাথ।

তা ছাড়া, আসল কথা হচ্ছে এই, কম দাম দিয়ে কম জমি নেবনা। বেশি দাম দিয়ে বেশি জমি নেব। আকাঁড়ার বছরে আড়াইশ' টাকার কম পণে অনেক টুকরো জমি কিনেছিলাম— এমন বিদঘুটে আইন এল দেশে, সব ফেরৎ হয়ে গেল। আবার কোন আইন হয় ঠিক কি। এবার হয়ত কমপক্ষে পাঁচশ' টাকা বলবে। তাই বেশি দামে বেশি জমির ফিকির খুঁজছি। মন্দ কি, বিঘের জন্য এক হাজার টাকা দেব।

চকচকে চোখে তাকাল অঘোর। ভাবল, টাকার গন্ধে সখানাথের বুঝি নেশা লাগে।

'হাতের চেয়ে আম বড় করবেন না কবরেজ মশাই', সখানাথ উঠে দাঁড়াল।

কাকুতি মিনতি করল না, হাতে পায়ে ধরল না, লোভের ফাঁদে পা বাড়াল না, সোজা উঠে দাঁড়াল। বললে, 'চিৎ হাতেই থাকা চলবে না চিরকাল, এবার একটু উপুড়হস্ত হতে শিখুন।'

'তার মানে?' অঘোরের কেমন ঘুর লাগল।

'যে খেটে মরে তার দাম নেই আর যে বসে বসে খায়

তার দাম আছে— এ দিন চলে যাচ্ছে। এখন নায়ের উপরে গাড়ি না হয়ে গাড়ির উপরে না—'

'কথা লাইন ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে সখানাথ।' অঘোর হুমকি দিল, 'মুখ সামলে!'

সখানাথের কি হয়েছে কে জানে। বোবা মুখে হঠাৎ কথা পেয়ে গেছে। আর, আশ্চর্য, তার ঝুঁকে পড়া ঢলকো শরীরে এসেছে একটা তেরিয়া ভঙ্গি।

'নিজের-নিজের ঘর সামাল! দেয়ালে এসে পিঠ ঠেকবে আস্তে আস্তে। এ পাশার দান বেশিক্ষণ থাকবে না মাশাই। সব যাবে, জমিদার যাবে, মহাজন যাবে—'

'আরো অনেক আছে রে, অনেক আছে।' গায়ের রাগ গায়ে মেরে অঘোর হঠাৎ উচ্চরোলে হেসে উঠল, 'আমরা দলে কি কম? রক্তবীজের বংশ আমরা।'

'সব শালার তেল মরবে এবার।' দেখাদেখি সখানাথ হেসে উঠতে পারল না। ঘরের বাইরে এসে গজরাতে লাগল, 'ভূতের ওঝায় ভূতেই বসায় আর সাপুড়ে মরে সাপের ছোঁয়ে। একই জুলুম জুয়াচুরি চিরকাল চলতে পারে না!'

তারপরে রাগ যখন পড়ে যায় তখন সেই অভ্যস্ত ভাগ্যের দুয়ারে বসে শাপ দেয়, 'অন্যায় করলে কারো পেতুল হয় না।'

সরজমিন তদন্তের ব্যবস্থা করা গেল না— উকিলকে

জানাতে এসেছিল সখানাথ। একগাল পান-খাওয়া মুখে উকিল বললে, 'তা আমি জানি। তার জন্য তোর ভাবনা নেই। তুই এক দঙ্গল সাক্ষী ধরে আন।'

শুধু মুখের সাক্ষীতেই হবে ?

'আমি দেখে নেব। মামলায় কিছু নেই, তবু তার মধ্যে থেকে আমি শাঁস বের করে দিয়েছি। আচোটে আবাদ ফলিয়েছি আমি। শুধু তুই আমাকে গাড়ি বোঝাই করে সাক্ষী চালান দে। রাম রহিম যদু-মধু যত পারিস। যত লোক তত রোক। তোরা ও সব বুঝবিনে। আর শোন, মামলা কবে ?'

'কাল।'

'ও, হ্যাঁ মনে পড়েছে। আর শোন, কাল সকালের কাচারি হবার অর্ডার আসেনি। তাই যেমন দুপুরে বসে কাচারি, তেমনি দুপুরে বসবে। সাক্ষীসাবুদ নিয়ে তাই এগারোটার মধ্যে এসে পড়বি।'

সে কি কথা! কেদার হাজরা তবে আসে কি করে ? কেদারই তো সব চেয়ে প্রাচীন সাক্ষী। গাঁয়ের মধ্যে মাথাওয়ালা।

তা সাক্ষী বুঝে তো কাচারি বসবে না। কেদার হাজরা না আসে, কাদের গাজীকে নিয়ে এলেই চলে যাবে। সকাল হোক দুপুর হোক, আমি ঠিক আছি।

সকালেই বা হবে না কেন? চিরদিন ধর্ম পূজোর দিন ভোরবেলা কাচারি বসেছে। উঠে গেছে এগারোটার আগেই। আজ হঠাৎ উলটোটা হবে কেন?

উপরালার মর্জি। যত উপর তত হালকা। তত গোলমাল।

আর, সকাল দুপুরে আসে যায় কি। সকাল হলেও কাঠগড়া, দুপুরে হলেও কাঠগড়া। মরা কাকের আবার চড়কের ভয়!

হোক কাঁটাল-পাকানো রোদ, ঘায়ের যন্ত্রণা গ্রাহ্য না করেই যাবে কেদার হাজরা। লোকের ভিড় যদি দুপুরে হয় তবে তারও সুযোগ এই দুপুরেই। ঘায়ের যন্ত্রণার চেয়ে ঘৃণার যন্ত্রণা অসহ্য।

দুপুরেই বসে গেছে আদালত। দু গাড়ি সাক্ষী নিয়ে হাজির হয়েছে সখানাথ। এক গাড়িতে সে আর কেদার আরেকটাতে বাকি কয়জন। যাক, ঠিক সময়ে এসে ধরতে পেরেছে যে কাচারি এই বাঁচোয়া।

বাদী জমিদার, বিবাদী সখানাথ কাউর— ডাক পড়েছে মামলার। ডাক পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সাইকেল পিওনের হাতে টেলিগ্রাম এসে হাজির, আজ কাচারি সকালে বসবে।

মধ্যরাত্রে বর কনে এসে পিঁড়িতে বসবার পর পুরোত বললে, বিয়ের লগ্ন আজ গোধূলিক্ষণে!

দুপক্ষ যখন সাক্ষীসাবুদ নিয়ে এসেই গেছি তখন হয়ে যাক মামলা। হয়ে যাক হেস্তনেস্ত। পরের দিন কেদার হাজরা হয়তো আরো অচল হবে। আর কোন সাক্ষী হঠাৎ ভেঙে পড়ে, বা বাগড়া দেয় ঠিক নেই। সখানাথ বললে তার উকিলকে, 'মিছিমিছি ফিরে যাব না আমরা, যা হবার আজই শেষ করে দিন। জমিদার পক্ষও রাজি। মিছিমিছি খাজনা আটক থাকছে। যত শিগগির ডিক্রি করা যায় ততই ভালো। হয়ে যাক কিস্তিমাৎ।'

কিন্তু উকিলেরা কিছুতেই রাজি নয়। আরেক দিনের ফি পাবার সুযোগ মিলছে, তা তারা ছেড়ে দিতে পারে না। বললে, 'ধম্মরাজের উপোস করেছি আমরা, শরীর আমলে পড়ছে, দাঁড়াতে পাচ্ছি না। বেশ তো, মামলা আরেক দিন হবে। সকাল বেলা কোর্ট হবার কথা, এখন তো ভর-দুপুর, এখন তো সত্যি করে বলতে গেলে কোর্ট বন্ধ, আমাদের ছুটি। এখন মামলা করতে গেলে বেআইনী হবে।'

সখানাথ কাকুতি করে উঠল, 'দু পক্ষ যদি রাজি থাকে তাহলে ছুটির দিনও মামলা হতে পারে। দু পক্ষই রাজি আছি আমরা। পরের দিন এত সাক্ষী জোগাড় করতে পারব না হয়তো—'

সখানাথের উকিল ঝামটা দিয়ে উঠল, 'পক্ষ রাজি

হলেই হল ? উকিলকে রাজি হতে হবে না ? উকিল ছাড়া পক্ষ কি ! যা বাড়ি যা।'

দূরে গেলে হামলায়, কাছে এলে কামড়ায়—এ কেমনতর ! সখানাথ অবাক হয়ে রইল।

বেশি দিন অবাক হয়ে থাকবার সময় কই ? মাসখানেক পর মামলার দিন পড়েছে, আবার লাগতে হয় তোড়জোড়ে। প্রথম দিন সাক্ষীর আনা-নেওয়ায় কুড়ি টাকা খরচা। না গেল দানে না গেল ব্রাহ্মণে ! খুব ধম্মের উপোস করলাম সে দিন। ঘরে ভাত নেই ধম্মের উপোস।

দুবার করে খরচ। উপায় নেই। ঘেরে পড়েছি ফের কাটিয়ে উঠতে হবে। যদি খাজনার কিছু ছাড়ান পাই।

দিনের দিন আবার দু'গাড়ি সাক্ষী নিয়ে হাজির হল সখানাথ। ভদ্র সমাজের ভিড়ের মধ্যে ক্ষণকালের জন্যেও মিশে যেতে পারে কিনা সেই আশায় হাতে পায়ে ন্যাকড়া জড়িয়ে চলে এসেছে কেদার হাজরা। গোষ্ঠ কুনাই এসেছে, এবার তার দোচালা রান্নাঘরখানা ছেয়ে দিতে হবে। বিজয় বাগ্দীর জমিতে বেগার চাষ দিতে হবে এক দিন। সাধু ফকিরের পক্ষে বিনা খরচে সাক্ষী দিতে হবে ফৌজদারিতে। কপালী কাহারের নগদ টাকার দরকার।

আজ ভরা কাচারি গমগম করছে দুপুরবেলা। আজ বন্ধও নেই ফন্দও নেই। মুলতুবি মামলা, প্রথমেই ডাক পড়বে।

ডাক পড়বে কি, জমিদার পক্ষ থেকে 'সাবকাশের' প্রার্থনা করেছে। ওয়াকিবহাল যে গোমস্তা, তার শয্যাশায়ী অসুখ। এক মাসের সময় চাই।

উপায় ? আবার সাক্ষী সাবুদ নিয়ে ফিরে যাব ? সখানাথ আঁধার দেখল।

উপায় কি ! প্রধান সাক্ষী অসুস্থ হয়ে পড়লে কী করা যাবে ! ভগবান না করুন, তোরও তো অসুখ হতে পারত।

'কিন্তু আমাকে মুলতুবি খরচ দেবে না ?' বুকুরের গলায় ককিয়ে উঠল সখানাথ, 'প্রথমবার না হয় বুঝলাম, বাদীর হাত ছিল না— কিন্তু এবার ? এবার তো সে যেচে সাবকাশ চাইছে। তবে এবারে দেবে না আমার খেসারৎ ?'

'দেবে বৈকি। দাঁড়া, একটা বক্তৃতা করি।' উকিল বললে।

সখানাথের উকিল তারপর একটা বক্তৃতা করলে। মুলতুবি হয় তো হোক, প্রধান সাক্ষী যখন পীড়িত তখন মুলতুবি হওয়াই উচিত, কিন্তু তার মক্কেলের ন্যায্য খেসারৎ চাই। দুখানা গরুর গড়ি করে সাক্ষী এসেছে আটজন। প্রায় সাত ক্রোশ রাস্তা। তারপর সাক্ষীদের এক বেলার খোরাকি। সব মিলে কম সে কম পঁচিশ টাকা ক্ষতিপূরণ।

অন্যপক্ষের উকিল আপত্তি করল না। ভাবখানা এমনি,

ত্রিশ টাকা হলেও তার আপত্তি নেই। জমিদার প্রবল, প্রজার জন্যে এমন অনেক ক্ষতিখরচ সে দিতে পারে।

'দেখলি পঁচিশ টাকা করে নিলাম।' সখানাথের উকিল পানের পিচ ফেললে দেওয়ালের কোণ তাক করে। 'তোর কুড়ি টাকার ওপরে পাঁচ টাকা বেশি। এমন বললাম যে অপরপক্ষ দাঁত ফোটাতে পারল না।'

কিন্তু টাকা আজ দেবে না?

আজ দেবে কোত্থেকে? আজ তো জমিদারের লোক সঙ্গে করে টাকা নিয়ে আসেনি। টাকা দেবে পরের দিন, যে দিন ফিরে তারিখ পড়ল মামলার। সেদিন তোকে রসিদ কেটে দিতে হবে, সই করতে না পারিস টিপ দিয়ে দিস।

পরবর্তী শুনানির দিন আবার এসেছে সখানাথ। এবার কেদার হাজরা আসেনি, পায়ের চারটে আঙুল খসে গিয়েছে এর মধ্যে, হাতের থাবা ঠুঁটো হয়ে গিয়েছে। আসেনি গোষ্ঠ কুনাই, এবার বলে, তুহা গরুটা বেচে দে সস্তা দামে। আসেনি কপালি কাহার। বলে, সাক্ষীর বাজার আরও চড়েছে এর মধ্যে। করকরে নগদ চাই হাতের মুঠোয়— এবার আগাম। কেউ চায় গামছা কেউ চায় ফতুয়া। কেউ বলে ছিঁচে পুঁতে দাও জমিখানা। ঘাড়ে শয়তান এসে সোয়ার হয়েছে সবাইর।

এসেছে শুধু নিভরস সেখ। এসেছে পায়ে হেঁটে। দুর্দিনের বন্ধুর মত।

পয়লা কাচারিতেই ডাক পড়ল মামলার। কিন্তু তার আগে গত দিনের মুলতুবি খরচ দাও। পঁচিশ টাকা সাক্ষীর খেসারতি।

তা দেবে বৈকি জমিদার পক্ষ। আদালতের হুকুম তারা অমান্য করতে পারবে না। এক পঁচিশ যাবে দশ পঁচিশ আসবে।

এই নাও টাকা, রসিদ দাও।

কিন্তু টাকা দেয় যে উকিলের হাতে। উকিলের হাতেই তো দেবে। উকিলই ত তার মুখপাত্র। তার মোক্তার-মুরুব্বি।

সে তো অসার দেহ, উকিলই তো তার কণ্ঠনালী।

সখানাথকে মুহুরি নিয়ে এল বারান্দায়। বলে, টিপ দে রসিদে। নথির সামিল থাকবে রসিদ।

'টিপ দেব যে টাকা কই?' সখানাথ হতভম্বের মত বললে, 'এই টাকা ক'টা পেলেও আমার কিছুটা সুবিধা হত। খোরাকির ধান চাল কিনতাম।'

ঝটাপটি দেখে দুপক্ষের উকিল এল হন্তদন্ত হয়ে।

ধমকে উঠল সখানাথের উকিল। বললে, 'কেন গোল করছিস? এ মুলতুবি খরচ উকিলের প্রাপ্য। এই চিরকালের

রেওয়াজ। এই চলে আসছে আবহমান কাল থেকে। তোর মুখের কথায় এ নিয়ম তো বদলে যাবে না!'

আকাটের মত দাঁড়িয়ে রইল সখানাথ। এত খরচ খরচা করে জুটিয়ে পাটিয়ে নিয়ে এলাম সাক্ষী, খেসারৎ পাবার হুকুম হল, আর তা যাবে উকিলের পকেটে। কেন, সকালবেলা আপনার বাড়িতে দু'টাকা ফি দিইনি আপনাকে ?

তা দিয়েছিস তো দিয়েছিস। দু টাকায় চলে একদিনের বাজার ? আমাদের তো দিবি না, দিবি যত হেঁজিপেঁজিকে। আমরা না বাঁচলে তোদের বাঁচাবে কে ?

'ডাল ধরতে পারি না বলেই ফ্যাকড়া ধরি।' বললে বিপক্ষের উকিল, মধুর প্রলেপের মত, 'কি করা যাবে বল, এই দেশাচার। এই টাকায় শুধু আমাদের ভাগ, তোদের নয়। এই টাকা দুজনে আমরা সমান ভাগ করে নেব।'

সমান ভাগ করে নেবে ? বিপক্ষ দলের উকিলও এর ভাগ পাবে!

উকিলের মধ্যে পক্ষাপক্ষি কি! সব এক পক্ষ! সব এক খেয়ার জল। এক স্বার্থের বসতকার।

ভাই এ মুলতুবি চাইলে আমি বাধা দিই না, আমি মুলতুবি চাইলে ও বাধা দেয় না। মুলতুবি খরচ যত উর্ধ্ব হতে পারে চুপচাপ থেকে তারই বরং একটু প্রশ্রয় দিই।

সবই তো জানিস-বুঝিস, মিছামিছি কেন রাগ করিস। কি দিন-সময় পড়েছে, আমাদেরও তো চলতে হবে ভদ্রলোকের মত! দে রসিদ দে।

'দেব না রসিদ।' সখানাথের কি হল কে জানে হঠাৎ ঘাড় মোটা করে তেরিয়ার মত বলে ফেললে, 'দেব না রসিদ।'

উকিলরা হাসল, মুহুরিরা হাসল। লেখা রসিদে কার একটা টিপ-ছাপ দিয়ে দাখিল হয়ে গেল নথিতে।

উকিলরা ঢুকল এজলাসে। জেলের পেছনের হাঁড়ির মত পিছু পিছু চলল মুহুরিরা।

'চলে আয় সখানাথ।' আদালতের আঙিনা থেকে ডাক দিল নিভরস, 'মামলায় আমরা হাজির হব না। হয়ে যাক একতরফা।'

সখানাথ নিভরসের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। যেখানে গাছের ছায়া পড়েনি, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ সেই জ্বলা জায়গায়।

কাগজে-কলমে ডিক্রি করে নিক ওরা। কাগজে-কলমে পারব না ওদের সঙ্গে। নিভরস তাকিয়ে রইল রোদের দিকে, 'চল্ আমরা অন্য পথ দেখি। দাঁড়াই গিয়ে জমির ওপর। দখল আটকাই।'

যেন এখুনি তার বেলা বয়ে যাচ্ছে। দুজনে দ্রুত পায়ে ফিরে চলল হাঁটা পথে। পক্ষের নাম ধরে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ডেকে মরছে আদালতের পেয়াদা।

গার্ড সাহেব

'বাবু, কিতাব !'

ঠিক বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ে। শুনেও শোনে না নিবারণ। ঘুমের ঘোরে পাশ ফেরে একবার।

কিন্তু ও-ডাক কি ভুল শোনবার ?

কল-পিওন আবার হাঁক পাড়ে : 'গার্ডবাবু, কিতাব হ্যায়।'

বই হয়েছে ! তার মানে সর্বনাশ হয়েছে।

দুখানা ছোট-ছোট কুঠুরিতে অধস্তন কোয়ার্টার। উনুনে আগুন দিচ্ছে লতিকা। ডাক শুনে সেও আঁৎকে ওঠে।

'বাবু, কিতাব !'

সমস্ত সংসার-শান্তির উপরে উদ্ধত বজ্র।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে লতিকা। সত্যি-সত্যিই কল-পিওন। নিজের চুল ছিঁড়বে না কল-পিওনের কিতাবটা—বুঝে উঠতে পারে না।

'এ কি, আজ না তোমার রেস্ট বেশি হবে বলেছিলে ?'

'হ্যাঁ, রোস্টার আজ ভালো ছিল। ভেবেছিলাম—' গলার স্বর ফোটে না নিবারণের।

কিন্তু চোখ ফোটাও। পিওন কল-বুকটা চোখের সামনে মেলে ধরে। হ্যাঁ, সই করো। দেখে নাও ঠিকঠাক। কোন ট্রেন, ইয়ার্ডে কোন লাইনে আছে, কোথায় যেতে হবে এ-যাত্রা। সব বিতং করে লেখা আছে বইয়ে। দেখে নাও। মনে মনে টুকে রাখো।

'তবে কি হবে!' লতিকা ককিয়ে ওঠে।

'আর কি হবে!' তক্তপোশ ছেড়ে উঠে পড়ে নিবারণ।

দশ বছর আগে এমন দিনে তাদের বিয়ে হয়েছিল। প্রথম পাঁচ বছর তারা ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়িয়েছে—নিবারণ মেসে, লতিকা বাপের বাড়ি, নয়তো বা শ্বশুরবাড়ির কোন আত্মীয়ের আশ্রয়ে। ছ বছরের মাথায় তারা প্রথম কোয়ার্টার পায়— ইনসাইড কোয়ার্টার। সেও দু-কুঠুরিরই আস্তানা— একটার মধ্যে আরেকটা ঘর। এবার, দশ বছরের বার, পাশাপাশি ঘরের কে-টাইপের কোয়ার্টার পেয়েছে। সামান্য একটু ভদ্রতা এসেছে বসবাসে। ইলেকট্রিক আলো হলে আরো একটু সুন্দর হত। রেণ্টসেকশানের বড়বাবুকে ধরেছিল নিবারণ— তিনি একটা আঙুল তুলে দেখিয়েছিলেন। তার মানে, ঘুষ চাই একশো টাকা।

বড় ছোট ঘরে, ছোট জীবনের মধ্যে আছে নিবারণ।

স্ত্রীর সঙ্গে খুব একটা সংকীর্ণ সম্বন্ধের মধ্যে। একটু অন্যরকম অর্থ দিতে চেয়েছিল আজ। আনতে চেয়েছিল একটু অন্য-রকম লাবণ্য। ঠিক করেছিল, আজ, দশ বছর বাদে এই প্রথম, সে তার বিয়ের তারিখে একটু উৎসব করবে। উৎসব আর কি, কজন বন্ধু-বান্ধবকে ডেকে একটু চা খাওয়ানো, চার সঙ্গে কিছু না হয় খাবার তৈরি করে দেবে লতিকা। বাইরে বসবার ঘরের মত করতে পারা যাবে একটা ঘরকে, তাই যা সুবিধে। বন্ধুরা কিন্তু জানতেও পাবে না কেন কি হচ্ছে— শুধু জানবে তারা দুজনে, একটু বা নতুনতরো অর্থে। কিছু ফুল জোগাড় করবে হয়তো। বিশেষ একটি অনুভবের লালিত্যে ফর্সা ও আস্ত একখানা শাড়ি পরবে লতিকা, বিকেলের দিকেই না-হয় দাড়ি কামাবে নিবারণ। মুহূর্তের জন্যে হোক, তবু সব আবার কেমন নতুন মনে হবে, মনে হবে আরম্ভের মতো, অজানার মতো—

রাত-ভোর ডিউটি করে সকাল চারটেয় আজ ফিরেছে নিবারণ। বাড়ি ফেরবার আগে রোস্টার দেখে এসেছে, অবস্থা বেশ ভালো— অনেক নম্বর গার্ড 'ইন' করেছে আজ। এমনিতে ডিউটির পর বারো ঘণ্টা মামুলি রেস্ট, তবে রোস্টারে বেশি গার্ড 'ইন' থাকলে আশা থাকে যে পালা আরো দূরে গিয়ে পড়বে। কিন্তু বিপদ এই, মামুলি রেস্টের পর সব সময়ে বাড়িতে তৈরি থাকো কখন 'কিতাব' এসে হাজির হয়।

আজ নিবারণ আন্দাজ করেছিল, বারো ঘণ্টার কায়েমী বিশ্রামের পর আরো কয়েক ঘণ্টা ফাউ মিলবে বোধ হয়। সেই ভরসায়ই করতে গিয়েছিল সে এই হাঙ্গামা। কিছু ফুল-পাতা কিনেছিল, কিনেছিল কিছু গন্ধওয়ালা চা, ছোট্ট এক শিশি দামি এসেন্স।

'বন্ধুদেরও তো বলেছ—' মনে করিয়ে দেয় লতিকা।

'তেমন করে কিছু বলিনি। বলেছিলাম রোস্টার ভালো আছে, দু-চার ঘণ্টা মিলে যেতে পারে একস্ট্রা। এক হাত তাস হবে'খন এসো। আর এলেই— এটা সর্বত্র উহ্য— একটু চা-টা—'

তেমন করে কিছু বলিনি। একটু যেন বাজল লতিকাকে। বলতে লজ্জা হয়েছিল নিশ্চয়ই! নিমন্ত্রিত বন্ধুরা এসে ফিরে যাবে তার চেয়ে সে-লজ্জা অনেক বেশি।

'বা, লজ্জা কি। চাকরি যখন করছি তখন চাকরি তো করতেই হবে—'

'এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে ভিক্ষে করাও ভালো।'

এই কথাটা আরো একদিন বলেছিল লতিকা। তখন ছিল তারা ইনসাইড কোয়ার্টারে, এক ঘরের মধ্যে আরেক ঘরে। শীতের রাত, পাশাপাশি শুয়ে আছে দুজনে। টিপিটিপি বৃষ্টি হচ্ছে তার উপর। বেশ একটা ঘুম-না-আসা অথচ ঘুমেরই মতন মনোহর রাত। হঠাৎ রাত-দুপুরে দরজায় কে

ঘা দিলে। 'বাবু! বাবু! কিতাব!' চোর ডাকাত নয়, কল-পিওন। মাথায় ছেঁড়া ছাতা, হাতে হাত-বাতি। গাড়ি বুকিং হয়েছে তারই খবর দিতে এসেছে। এখন যদি রাত বারোটা হয়, গাড়ি নিয়ে নিবারণকে বেরুতে হবে ছুটোয়। ছু ঘণ্টা আগে নোটিশ আসে কিতাবের। কি গাড়ি জিগগেস করছ? রাগ কোরো না— মাল-গাড়ি। একে গার্ড, তায় মাল-গাড়ির গার্ড।

তবু, তবু সেই তপ্ত শয্যা ছেড়ে উঠে পড়তে হয়েছিল নিবারণকে। ছু ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিতে হবে। লতিকাকে উঠে খাবার-দাবার করে ভরে দিতে হবে টিফিন-কেরিয়ার। ইউনিফর্ম পরে গায়ে বর্ষাতি চাপিয়ে এক হাতে টিফিন-কেরিয়ার আরেক হাতে হ্যাণ্ড-সিগন্যাল ল্যাম্প নিয়ে কাদা-জলের মধ্যে ছপ-ছপ করতে-করতে যেতে হবে ইস্টিশান—

বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে সেদিন বলেছিল লতিকা: 'এর চেয়ে ভিক্ষে করা ভালো ছিল—'

কিন্তু আজ যেন রাগ নয়, আজ দুঃখ। সেই ছোট ঘরে ছোট হয়ে থাকার হুকুম। একটা নতুন কিছু দেখবার নতুন কিছু বোঝবার থেকে বঞ্চনা।

কাছে এসে গলা নামাল লতিকা: 'সিক রিপোর্ট করে দিলে হয় না?'

নিবারণ হাসল। সে হাসির অর্থটা ভয়ের মতন স্পষ্ট।

সেবার মিথ্যেমিথ্যি সিক-রিপোর্ট করেছিল নিবারণ। ফলে বড় ছেলে অন্তর ডবল-নিউমোনিয়া হয়েছিল। আরেকবার হয়েছিল নিজের রক্ত-আমাশা। এমনিতে কত মিথ্যের মধ্যেই তো আছে তারা, ছোট-বড় কত জুয়াচুরির মধ্যে— সেগুলি যেন গায়ে লাগে না, সেগুলির যেন বোধ-স্পর্শ নেই— কিন্তু অসুখের ভয়টা যেন বুক-চেপে-ধরা, দম-বন্ধ-করার মতন। লতিকা কথা ফিরিয়ে নিল তাড়াতাড়ি। বললে, 'আর কোন উপায় নেই?'

আরেক উপায় কেতাবে সই না করা। অর্থাৎ বাড়িতে না-থাকা। মামুলি রেস্টের পর পরোয়ানার প্রত্যাশায় তুমি বাড়িতে তটস্থ হয়ে থাকবে না এ হতেই পারে না। নিজের কর্মদণ্ড নিজেকেই সই করতে হবে। তা যদি না করো, তবে তোমার জরিমানা হবে, নামিয়ে দেবে নিচু মাইনেতে, পাশ-ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ করে দেবে। চাকরি করতে বসে এ সব গুনাগারে সাধ্য থাকতে কে রাজি হয় বলো?

তবু ওরি মধ্যে জিগগেস করে লতিকা: 'এবার কোথায় ট্রেন হল?'

'গয়া।'

যেন কত উপেক্ষার স্বর। মোকামায় না গিয়ে এবার যে নিবারণ গয়া যাচ্ছে আর লতিকা যে কোথাও যাচ্ছে

না, থাকছে বাড়ির মধ্যে বন্ধ হয়ে— তুই-ই যেন একই কথা।

একজন যে যাচ্ছে আরেকজন যে বসে থাকছে তুই-ই যেন সমান নিরর্থক।

কিন্তু এখন আর বসে থাকা চলবে না লতিকার। খাবার-দাবার তৈরি করে দিতে হবে নিবারণকে। যে উনুন সে আজ জ্বালতে যাচ্ছিল, মাখতে যাচ্ছিল যে আটা, তাতে আজো সে কোনো নতুন অর্থ দিতে পারল না।

শুরু হয় সেই মামুলি কর্মচক্র।

সেজেগুজে বেরিয়ে পড়ে নিবারণ। যেন বাজারে যাচ্ছে বা বেড়াতে যাচ্ছে তার যাওয়ার চেহারাটা যেন এমনি। লতিকা একটু দাঁড়িয়ে পর্যন্ত দেখে না। ছেলেমেয়েগুলো কে কোথায় ছিটকে রয়েছে তার কোনো খোঁজ-খবরে দরকার নেই। যাবার আগে লতিকাকে কোনো বিষয়ে কিছু বলতে বা সতর্ক করে দিতে হবে না। কবে ফিরবে, কাল না তু-তিন দিন পর, সে প্রশ্নও অবান্তর। দিন-দিন কেরানি যেমন আফিস করতে যায় এও তেমনি। এদিকে হোক মোকামা বা গয়া, ওদিকে খিদিরপুর বা চিৎপুর— সব একই চর্বিতচর্বণ। একই থোড়-বড়ি-খাড়া। এতটকু রহস্য নেই কোথাও। নেই এতটুকু কোথাও নতুনতরো অনুভূতি!

'এ-এস-এম'-এর অফিসে গার্ডের হাজিরাবইয়ে সই

করে নিবারণ। ঠিক কটার সময় গাড়ি সাজানো হবে জেনে নেয়। বক্স-গোডাউনে গিয়ে বোতলে খাবার জল ভরে। জল আর টিফিন কেরিয়ার বাক্সে ভরে চলে যায় অয়েল গোডাউনে। ওখান থেকে টেইল-ল্যাম্প নিতে হবে সই করে। ট্রেনের পিছনে যে লাল বাতি জ্বলে সেইটেই টেইল-ল্যাম্প। আরো, নিতে হবে কেরাসিন তেল। সেই তেলে হাত-বাতি জ্বালাবে, জ্বালাবে টেইল-ল্যাম্প আর সাইড-ল্যাম্প। আজ চারটের সময় বই হয়েছে যখন, ষোলো আউন্স তেল পাওয়া যাবে। একটু যেন আশ্বস্ত হল নিবারণ। তেল কিছুটা সরানো যাবে আজকে।

তেলও ভরা হল লাইন-বক্সে। কি না আছে এই বাক্সটায়! টাইমটেবল, একটা লাল আরেকটা সবুজ নিশান, টেইল-ল্যাম্প আর সাইড-ল্যাম্পের তিনটে বার্নার, দুটো লাল সাইড— আর ডিটোনেটর। তা ছাড়া গার্ডস মেমো-বই— তাতে লেখা থাকবে ট্রেনের নম্বর, যাবে কোথা, কটার সময় য়্যারেঞ্জ, কটা ওয়াগন— তাদের টেয়ার-ওয়েট কত, কতই বা লোডওয়েট— স্টেশনের কোড, কোন স্টেশন কোন সময়ে পার হল তার ফিরিস্তি। তারই এক পাশে টিফিন-কেরিয়ার, জলের বোতল, গ্লাশ— সঙ্গে ছোট্ট ভাঁড়ার ঘর— চাল ডাল আটা নুন তেল মশলা আলু পেঁয়াজ চা আর চিনি। হ্যাঁ, মাথার তেল সাবান দাড়ি কামাবার সরঞ্জামও আছে—

বাক্স-কুলির টিণ্ডেল এসে ল্যাম্প-টিণ্ডেলের থেকে জেনে নেয় ইয়ার্ডে কোন লাইনে গাড়ি দাঁড়িয়ে। লাইন-নম্বর বলে দেয় সে বাক্স-কুলিকে। বাক্স-কুলি সেই নম্বরের ট্রেনের ব্রেক ভ্যানএ তুলে দিয়ে আসে বাক্স।

বাক্স পাঠিয়ে দিয়ে এসিস্ট্যাণ্ট ইয়ার্ডমাস্টারের ক্যাবিনে যেতে হয় নিবারণকে। সেখানে নাম্বার-টেকাররা ট্রেনের ফর্দ বা 'গাইডেন্স' বানিয়ে রেখেছে। মানে, কতগুলো ওয়াগন আছে, কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাবে, টেয়ার-ওয়েট লোড-ওয়েট কত— তার হিসেব। ফর্দ মিলিয়ে একধার থেকে গাড়ি চেক করতে শুরু করো এবার। দেখ সিল আর রিভেট ঠিক আছে কিনা,— এধার দেখেছ তো ওধারও পরখ করো। বয়ে গেছে অত মিলিয়ে দেখবার। একটা মাল-গাড়ির ফুল-লোড হল ষাট ওয়াগন— এটার মধ্যে আছে বুঝি পঞ্চান্নটা। কোথায় কোনো ফ্ল্যাপ-ডোর আলগা থাকে তো থাক না— তার কি। যারা মাল বুক করে তারা দেখতে পারে না? কিন্তু গাড়িতে গাড়িতে কাপলিং ঠিক আছে কিনা, অর্থাৎ শেকল দিয়ে যে গাঁটছড়া বাঁধা আছে তা আঁট আছে কিনা— তা তো দেখবে! বয়ে গেছে। তার জন্যে মাইনে দেয়া হয় না নিবারণকে।

ওয়াচম্যানের খাতায় তাড়াতাড়ি সই করে দেয় নিবারণ।

হ্যাঁ, পঞ্চান্ন ওয়াগন, সিল-রিভেট করেক্ট। ঠিক আছে। ও-কে।

তারপর ড্রাইভারের সঙ্গে দেখা করে। ঘড়ি মিলিয়ে নেয়। কোম্পানির থেকে ঘড়ি দিয়েছে দুজনকে। সে যেমনতরোই ঘড়ি হোক, মিল থাকলেই হল। গাইয়ে-বাছুরে মিল থাকলে বনে গিয়েও দুধ দেবে।

ড্রাইভার জে-টি-আর ফর্ম আর ফুয়েল-ফর্ম বের করে দেয় নিবারণকে। জে-টি-আর মানে জয়েন্ট ট্রেন রিপোর্ট— কটার সময় কোন স্টেশন পার হচ্ছে ট্রেন তার হিসেব দুজনকে রাখতে হবে আলাদা। শেষ স্টেশনে পেশ করতে হবে। মিল না থাকলেই মুশকিল। তা একযাত্রায় কি পৃথক ফল হয় কখনো? কি বলো হে ইয়াসিন?

এঞ্জিনের টেণ্ডারে ক'টন কয়লা নিয়েছ? নয় টন। দেখ এই ফুয়েল-ফর্ম।

সিগন্যাল ডাউন হলেই স্টার্ট কোরো। ইয়াসিনকে বলে দিয়ে নিবারণ তার ব্রেকভ্যানে গিয়ে ওঠে।

হ্যাঁ, এই ইয়ার্ডে সিগন্যাল আছে। যে ইয়ার্ডে সিগন্যাল নেই সেখানে ট্রেন এ্যারেঞ্জ করলেই ঝামেলা। ড্রাইভারকে গিয়ে স্টার্টিং অর্ডার নিয়ে আসতে হবে। তটস্থ হয়ে বসে থাকো ততক্ষণ। স্টার্টার-সিগন্যাল আর য়্যাডভান্স-স্টার্টার সিগন্যালের মধ্যে অল-রাইট সিগন্যাল দেখাও— রাত হলে

শাদা আলো দেখিয়ে, দিন হলে হাত নেড়ে। তুমিও দেখাও ড্রাইভারও দেখাক। একটু ভুলচুক হলেই কেলেঙ্কারি। ভাগ্যিস এই ইয়ার্ডটা তেমনি কানা নয়— লাল-সবুজ চোখ আছে জ্বলজ্বলে। তাই ড্রাইভারের উপর ভার দিয়ে ব্রেকভ্যানে গিয়ে বসেছে চুপচাপ। যখন ছাড়তে হয় ছাড়বে।

একেবারে চুপচাপ। পঞ্চান্নখানা মালবোঝাই ওয়াগনের পিছনে একা-একা চুপকরে বসে থাকা। সেই কত দূরে এঞ্জিন, সেইখানে যা প্রাণস্পর্শ। তবু তো এঞ্জিনে ড্রাইভারের পাশে ফায়ারম্যান থাকে, জ্যাক থাকে— গল্প করা যায়। কিন্তু গার্ডের কেউ নেই, কিছু নেই। মাইলের পর মাইল চলেছে গাড়ি, সে একেবারে একা। চলেছে বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, অন্ধকার চিরে-চিরে, তাকে ঘিরে সমস্ত বিশ্বসংসার যেন অনন্ত শূন্যে ভরে রয়েছে। তার যেন কোনো আত্মীয় নেই, প্রতিবেশী নেই— কেউ এসে তাকে খুন করে গেলেও কেউ বাধা দেওয়া দূরে থাক অস্ফুট আপত্তিও করবে না। ইয়াসিনও বুঝতে পারবে না সে খুন হলো! যদি কারা গাড়ি থামিয়ে ওয়াগন লুট করে, মুখ বাড়িয়ে একবার দেখবেও না নিবারণ। ঘুম না এলেও ঘুমুবার ভান করবে। ডাকাতদের সঙ্গে সে লড়তে যাবে নাকি খালি-হাতে? এই একটানা একঘেয়েমির চেয়ে রাস্তার

মাঝে দু-একটা রাহাজানি মন্দ নয়। অন্তত খানিক লোক-জনের হৈ-চৈ কানে আসে।

দশ দিক আঁধার করে রাত নেমেছে। এটা থ্রু গুডস-ট্রেন, ওয়াটারিং স্টেশন ছাড়া থামবে না। কিন্তু মেইল ও এক্সপ্রেস, এমনকি প্যাসেঞ্জারকে পর্যন্ত আগে যাবার অধিকার ছেড়ে দিয়ে লুপে গিয়ে শান্ট করছে। কখনো বা সেকশন ক্লিয়ার পায়না, পিছনের স্টেশনে দাঁড় করিয়ে রাখে।

যদি স্টেশনে এসে দাঁড়ায় তবে দুচারটে আলো বা গোটাকয় নিশ্বাসের না-হয় আভাস মেলে। তখন আসান লাগে কিছুটা। তাইতে যারা প্যাসেঞ্জারে কাজ করে তাদের তত হয়রানি নেই। কতক্ষণ পরে-পরেই তারা মানুষের হাঁক-ডাক শোনে, নিজের সমসুখদুঃখের সঙ্গী কেউ আছে তার পরিচয় পায়। কিন্তু এখানে এ যাত্রায় কতক্ষণে স্টেশন পড়বে? আর স্টেশন পড়লেই বা কি! প্যাসেঞ্জার কই? কই সেই সুন্দর জনকোলাহল?

নিবারণ একেবারে একা। নিরবকাশ ভাবে নিঃসঙ্গ। পঞ্চান্নটা গাড়ির পরে কোথায় ড্রাইভার আর ফোরম্যান আর জ্যাক, হাত বাড়িয়ে নাগাল পায় না কিছুতেই। মনে হয়, গাড়ি যেন কেউ চালাচ্ছে না, গাড়ি আপনিই চলেছে। যেন কোথাও থামবে না কোনোদিন। শুধু

কতগুলো রাশীভূত বস্তু আর সে একাকী এক প্রাণ, এছাড়া আর কেউ নেই এই গতির উন্মুক্তিতে।

ঠিক এমনি করেই ভাবছে না নিবারণ। ভাবছে, আজকের জার্নিতে থ্রিল কই? ইয়াসিন কি এ-যাত্রায় কোনো মার্চেন্টের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেনি?

প্যাসেঞ্জারে কাজ করলে অনেক সুবিধে। লোডিং-মানির বখরা পাওয়া যায়। ব্রেকে যে সব মাল যায় তাতে পয়সা দেয় মার্চেন্টরা, পার্শেল-ক্লার্করাই তা উশুল করে, ভাগের পয়সা লোডিং-এর সময় দিয়ে দেয় গার্ডকে। ধরা পড়বার ভয় নেই। আর যদি টি-টি-ই হতে পারতে, তবে 'ঝাঁপসেই' ফেঁপে উঠতে নিটোল হয়ে। 'ঝাঁপস' শোনোনি বুঝি? ও একটা মুখচলতি টার্ম— ঝাঁ করে আপোস করতে হয় বলেই সন্ধি করে ঝাঁপস। হ্যাঁ বাবা, সন্ধি করো। তোমার অন্ধিসন্ধি আমি জানি, আমারটা তুমি জানো। তবে কেন মিছিমিছি খচখচ করছ?

সুখে কাজ করে বটে গুডস ক্লার্করা— স্থায়ী ডে-ডিউটি, ঘুমের কোনো ব্যাঘাত নেই, আর উপরিও স্বচ্ছন্দ।

আর তোমাদের?

আমাদের কথা আর বোলো না। বলতেই বলে এক পা রেলে এক পা জেলে। মারি তো গণ্ডার লুটি তো

ভাণ্ডার। আর চোকা কড়ি রোখা মাল। হাতে-হাতে দে রে ভাই দাঁতে-দাঁতে খাই।

কিন্তু আজ হল কি? কোনো বন্দোবস্তই কি করেনি আজ ইয়াসিন? আজ কি ডোলভরা আশা আর কুলো-ভরা ছাই?

কোনো স্টেশনের বাইরে কি আজ আর গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়বে না? আসবে না কি কোনো মার্চেন্টের সাঙ্গো-পাঙ্গোরা? অফ-সাইডে সিল-রিভেট না থাকে তো ভালোই, আর থাকলেই বা খুলে ফেলতে কতক্ষণ? এই জঙ্গুলে অন্ধকারে কে তার খোঁজ রাখছে? সেই সব সাঙ্গোপাঙ্গরা ঢেরা-দেওয়া গাড়ি থেকে মাল খালাস করে নেবে না—চিনি বা আস্ত গম বা কেরাসিন? সঙ্গে-সঙ্গে ড্রাইভার আর গার্ডের হাতে আসবে না নোটের পাঁজা?

ট্রেন যে হঠাৎ থামিয়ে দিলে তার জবাবদিহি কি? ড্রাইভার মুখে-চোখে নিরীহ-নির্দোষের ভাব এনে বলবে, কি করব, এঞ্জিনে স্টিম পড়ে গিয়েছিল, স্টিম বানাতে হচ্ছিল, কিংবা, কয়লা ঝামা হয়ে গিয়েছিল, আগ বানাতে হচ্ছিল—

পরের স্টেশনে হয়তো চেক করতে আসবে ওয়াচম্যান। হয়তো খোলা দেখবে গাড়ি। দেখুকগে, বয়ে গেল। ওয়াচম্যানের বইয়ে গার্ড রিমার্ক দিয়ে দেবে, গাড়ি খুলে দিয়েছে কে মাঝ-পথে, জি-আর-পিকে না হয় তার করে

দেবে, মেসেজ পাঠাবে ওয়াচম্যান ইন্সপেক্টরের কাছে। তারপরে তোমরা ইনকোয়ারি করো। আর যার মাল খোয়া গেছে সে উলটে ক্লেম দিয়ে বা কোর্ট করে তার ক্ষতি-খেসারৎ আদায় করে নিক।

ওয়াচম্যানও কম যায় না। গার্ডের থেকে অল-করেক্ট সই নিয়ে পরে গাড়ি খুলে মাল বার করে নেয়। গাড়ি তখন হয়তো অন্য স্টেশনে চলে গিয়েছে, ওয়াচম্যানের আর ঝক্কি নেই। ফাঁসবে তো গার্ড ফাঁসবে। তখন সেই ভাঙা গাড়ি সিল করিয়ে চেকিং-এর জন্যে কেটে রেখে মেসেজ পাঠিয়ে দাও। শুরু হোক ইনকোয়ারি। গার্ড বলবে, আমি জানি কি, মাঝপথে কে কেটেছে— আর ওয়াচম্যান বলবে আমি জানি কি, এই দেখ গার্ডের অল-করেক্ট দস্তখৎ। আর ড্রাইভার এমন একখানা মুখ করবে যেন তিলক না কাটলেও সে পরম বৈষ্ণব। সে যে কখন কার সঙ্গে সড় করবে কেউ জানে না। সর্বাঙ্গে ঘা, ওষুধ লাগাবে কোথা? সুতরাং, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন, খেসারত দিয়ে মরো রেলকোম্পানি।

এরকম একটাও বড় দাঁও পড়েনি নিবারণের হাতে। একবার একটা হাতে আসতে আসতে ফসকে গেল। পরের মাল চুরি করে নেয় মার্চেন্টের চর-অনুচর, এতে হাঙ্গামা বেশি। সব চেয়ে সুবিধে নিজের মাল চুরি করা। গাড়ি চিনতে

দেরি হয় না, আর মাল বার করবার কায়দাটাও রপ্ত-মুখস্ত থাকে। চক্ষের নিমেষে ঘটে যেতে পারে ঘটনা।

হলও তাই। ব্রিজ রিপেয়ার হচ্ছে, গাড়ি দাঁড় করাল ড্রাইভার। কিছু বলতে পারো না ড্রাইভারকে। হুকুম টাঙানো আছে : স্টপ ডেড ফর টু মিনিটস। যেই গাড়ি দাঁড়াল, অমনি বরজলাল মাড়োয়ারির লোক এসে তাদের গাড়ি খুললে। বাইরের চেহারা থেকেই বুঝে নিলে কোন গাড়ি। কি ভাবে সিল-রিভেট ভেঙে খুলে ফেলতে হবে দরজা জানা আছে তার কলকৌশল। গম যাচ্ছিল বস্তা করে। চক্ষের পলকে প্রায় কুড়ি বস্তা ধুপধুপ করে ছুঁড়ে ফেললে মাটিতে। স্টার্ট দিল গাড়ি, একটা লোক বুঝি নামতে পারেনি। আহা, ভারি তো তখন গাড়ির স্পিড! হুকুম আছে টাঙানো : পাস দি ব্রিজ য়্যাট ফাইভ মাইলস পার আওয়ার। নেমে পড়ল লোকটা। ট্রাক তৈরি ছিল রাস্তায়। বোঝাই হয়ে গেল বস্তা। বেরিয়ে গেল এক ফুঁয়ে। যেখানকার গম সেখানে গিয়ে উঠল।

নিবারণ নিরিবিলিতে দেখা করেছিল ড্রাইভারের সঙ্গে। সে তো আকাশ থেকে পড়ল। ব্রিজের মুখে গাড়ি দাঁড় করাতে হবে এ তো সরকারের হুকুম। সে কাঁটায়-কাঁটায় হুকুম তামিল করেছে— সে কিছুই জানে না। এক আঙুলে দিব্যি তুড়ি বাজিয়ে গেল সে।

বরজলালের গদিতেও খোঁজ করেছিল নিবারণ। তারা স্পষ্ট মুখ মুছলে। কে-না কে ডাকাতি করে মাল বার করে নিয়েছে তারা তার জানে কি। তারা উলটে ক্লেম দিয়েছে অফিসে। ক্লেম না মানে মোটা টাকার মামলা ঠুকবে আদালতে।

একেই বলে, খাবে আবার ছাঁদাও বাঁধবে।

এ তো সামান্য চুরি। কখনো কখনো আবার তেন্নাথের মেলা হয়। ড্রাইভার গার্ড আর ক্যাবিনম্যান— ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর— ত্রিনাথের যোগাযোগ। সেসব পুকুর চুরি না বলে বলতে পারো গুদোম চুরি। ক্যাবিন-ম্যান আউটার সিগন্যাল খারাপ করিয়ে রাখে। সিগন্যাল যদি কাজ না করে, তবে গাড়ি চলে কি করে ? ড্রাইভারকে তাই আউটার সিগন্যালের কাছে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখতে হয়। জি-টি-আর-এ ভালো করে কৈফিয়ৎ লেখে গার্ড। ডিসট্যান্ট সিগন্যাল আউট অফ একশন। সিগন্যাল সারিয়ে ফের চালু করতে কম-সে-কম দশ-পনেরো মিনিট কোন না লাগে। আর সেই দশ পনেরো মিনিটের মধ্যেই চিচিং ফাঁক— যাকে বলে গুদোম সাবাড়।

এসব বড় চুরি। রাজসূয় ব্যাপার। এসব ব্যাপারে অংশ নিতে পারাও ভাগ্যের কথা। নিবারণের অদৃষ্টে ঘটনাচক্র এমনভাবে কখনোই ঘুরবে না যাতে সে তেন্নাথের

মেলায় বসে এক ছিলিম গাঁজা টানতে পারে। সে ভীরু, সে খুঁতখুঁতে।

এমনি ড্রাইভার যা জোগাড় করে দিয়েছে মাঝে-মধ্যে। পথের মধ্যে যা দু-একটা ছককাটা ফন্দি-আঁটা রাহাজানি হয়েছে তারই লাভের বখরা। নিবারণ সাতেও নেই পাঁচেও নেই, হঠাৎ খ্যাঁচ করে বন্ধ হয়ে গিয়েছে গাড়ি। গাড়ি বন্ধ না হলে মাল খালাসি চলবে কি করে? আর, গাড়ি বন্ধ হলেই গার্ডের তাঁবেদারিতে চলে এলে। কেননা গার্ডের হাতে জি-টি-আর, টাইমিং-এর ফিরিস্তি। অতএব গার্ডের হাতেও কিছু গুঁজে দাও।

কিন্তু সব সময়েই ছক কেটে আসে না। এসে পড়ে গ্রাম্য ডাকাতের দল। লাইনের উপরে পাথর বা গাছ ফেলে রাখে। গাড়ি দাঁড় করিয়ে লুটতরাজ করে। দু-প্রান্তের দুই লোক, কোনো সংযোগের সুবিধে নেই— তাই চুপচাপ বসে থাকো যে যার এলেকায়। আর সংযোগ থাকলেই বা কি, লুটেরাদের বাধা দেবার তোমাদের রসদ কোথায়? আর, যেখানে রস নেই সেখানে রসদ থাকলেই বা কি? নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও, ডাকাতরা চলে গেলে হাত-বাতি দেখিও, স্টার্টের সিটি দেবে ড্রাইভার।

ডাকাত যদি না থাকে, খুচরো চোর আছে অগণ্য। দিল্লি থেকে হাওড়া পর্যন্ত চলেছে এই চোরের অক্ষৌহিণী।

এরা গাড়ি থামায় না বটে কিন্তু যেইখানেই গাড়ি থামে, স্টেশনেই হোক বা স্টেশনের বাইরেই হোক, ঠিক এসে হাজির হয় কাতারে-কাতারে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে সরু লোহার শলা, আর গলায় একটা করে বেশ খানিকটা কাপড়ের টুকরো বাঁধা। প্রত্যেক গ্রামেব কামারশালায় তৈরি হচ্ছে এই লোহার শলা, কারুর বা চাই লিকলিকে তলোয়ার। মালগাড়ি দাঁড়ালেই প্রত্যেক ওয়াগনের ফ্ল্যাপ-ডোরের ফাঁকের ভিতর দিয়ে এরা শলা ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে খোঁচা মারে। নেহাৎ যদি পাট বা তামাক হয়, তা হলে অবিশ্যি কোনো সুসার নেই, কিন্তু শুকনো আর দানা-ওয়ালা বা গুঁড়ো-গুঁড়ো জিনিস হলেই খোঁচা খেয়ে ঝরঝর করে বেরুতে শুরু করবে। আর যেই বেরুনো, সর্ষে কি মুশুরি ডাল আটা কি সুজি, চিনি কি চাল— বা নিতান্ত বিড়ির শুকো— গলার কাপড় তুলে ধরে ভরে নাও এক থলে। এমনি জনে-জনে, যার যেমন ভাগ্য। আর যেই গাড়ি চলল অমনি সবাই এক দাপটে পগার-পার।

কি হল আজ? বরাকর— আস্তে আস্তে ধানবাদ পেরুলো— এখনো কোনো থ্রিল নেই? ড্রাইভার কি আজ একেবারে বেকার হয়ে থাকবে?

কি মনে করে বাইবে একবার তাকাল নিবারণ। একি, জমাট মেঘ করেছে যে।

বৃষ্টি শুরু হলে কি অবস্থা যে হবে এ ব্রেক-ভ্যানের, ভাবতেও মন খারাপ হয়ে যায়। ফাটা দিয়ে পড়বে জল আর ফুটো দিয়ে ঢুকবে হাওয়া। কিন্তু কে জানে বৃষ্টি শুরু হলেই বোধ হয় পার্টিরা এসে দেখা দেবে। অন্ধকার যত বেশি ঘোরালো হয় ততই যেন চুরির সুবিধে—

সুবিধে হলেই বা কি, না হলেই বা কি, নিবারণ কী জানে। নিজের থেকে তার কোনো তোড়জোড় নেই, যন্ত্রতন্ত্র নেই। ড্রাইভার যদি কোথাও কোনো ব্যবস্থা করে রাখে, আর তা যদি তার এলাকায় এসে পড়ে, তবেই সে আশা করতে পারে কিছু। নইলে তার কাঁচকলা!

ঘুষ না পেলেও ঘুষের স্বপ্ন দেখতে মন্দ লাগে না।

মাঝে মাঝে মাল গাড়িতে ক্যাটল-ওয়াগন থাকে। তার মানে গরু মোষ যায় বোঝাই হয়ে। কিছু দুধ দুয়ে দে দেখি। সঙ্গে যে গয়লা থাকে সে দুয়ে দেয় গাড়িতে বসে। সঙ্গে দু-চারজন বেশি লোক নিতে যদি চাস, সিগারেট খাবার জন্যে দু-চারটে টাকা দে, নিয়ে যা পাহারাদার। আর যদি কখনো তারা গাঁইগুঁই করে, বলে, তোদের গাড়ি হট-য়্যাক্সল হয়েছে, মানে চাকা গরম হয়েছে— কেটে রাখতে হবে গাড়ি। কেটে না রাখলে আগুন লেগে যাবে, বেলাইন হয়ে যাবে গাড়ি, সর্বনাশ হয়ে যাবে। নে, নেমে পড়। তখন হাতজোড়। তখন দু-পাঁচ টাকা বেশি আসে।

সারাক্ষণ নিবারণ কি শুধু ঘুষের কথাই ভাববে ?

তা ছাড়া আর কী আছে ভাববার ?

কোনো একটা বই পড়ো না !

বই পড়বে ! যা তোমার গাড়ির দুলুনি আর ঝাঁকুনি, সাধ্য কি তুমি বইয়ের লাইনের উপর সোজা করে চোখ রাখো !

বেশ তো, বসে-বসে ঢোলো না ! লোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয়, তুমি তো তবু বসবার জায়গা পেয়েছ।

হ্যাঁ, ঘুমুই, আর সেই ফাঁকে ড্রাইভার একাই ষোল আনা মেরে নিক। আমাকে না বলে ড্রাইভারকে ঘুমুতে বলো।

সেবার মধুপুর থেকে গাড়ি ছাড়ছে হন্তদন্ত হয়ে এক যুবক আর যুবতী এসে হাজির। দয়া করে তাদের যদি তুলে নেয় নিবারণ। কি ব্যাপার ? তারা মধুপুরে আউটিং করতে এসেছিল দেওঘর থেকে, ফিরে যাবার দুপুরের ট্রেনটা মিস করেছে, এখন যদি এ মালগাড়িতে যেতে না পায় তা হলে কেলেঙ্কারির একশেষ হবে। দেখুন, আপনি না দয়া করলে— আপনি যদি না মুখের দিকে তাকান—

মুখের দিকে তাকাবার অত গরজ নেই নিবারণের। সে মনি-ব্যাগের দিকে তাকাল। বললে, দশ টাকা।

তাই দেব, উঠে পড়ল যুবক-যুবতী।

কিন্তু উঠে পড়ে দেখে দুজনের কাছে মিলিয়েও দশ

টাকা হয় না। যদি বা হয়, জসিডি থেকে দেওঘরের ভাড়ায় কম পড়ে।

নিবারণ বললে, আমি তা জানি না। দশ টাকার এক আধলাও কম নয়। আর তা আগে চাই, এক্ষুনি-এক্ষুনি। শেষে জসিডিতে এলে যে কলা দেখিয়ে সটকান দেবে তা হবে না।

দিয়ে দাও পুরোপুরি। মেয়েটি বললে দর্পিণীর মত: জসিডিতে নেমে দেখা যাবে ধার পাই কিনা।

পুরোপুরিই আদায় করল নিবারণ। দর্পই বলো আর প্রেমই বলো, ওসবে আর চোখ পড়ে না, এখন চোখ শুধু বাঁধা মাইনের উপরে কিছু উপরি আয়ের দিকে। একে আর ঘুষ বোলো না, বোলো বকশিস বোলো অনুগ্রহ।

কিন্তু আজকের দিনে একটু প্রেমের কথা ভাবলেই বা। স্ত্রীর হাতের অসমাপ্ত মালা না নিয়ে চলে এসেছ তুমি। এখন স্নিগ্ধ মনে তার কথা একটু ভাবা উচিত।

স্নিগ্ধ মন-টন বড় কথা। ওসব বড় কথা বড় ভাব আসবে না ঘুণাক্ষরে। বরং ভাবা যাক, গাড়ি কখন থামবে কোন মাঠের মাঝখানে, আসবে কোন এক মার্চেন্টের লোকজন, মাল-খালাসির মিলবে কিছু নগদ মুনফা। তা হলেই প্রেম পরিতৃপ্ত হবে। পেট পরিতৃপ্ত হলেই প্রেম পরিতৃপ্ত।

গয়া থেকে ফিরে গিয়ে নিবারণ যদি বলে, আর কিছু

নয়, শুধু এই কেরাসিন তেলটুকু এনেছি, তখন কী বলবে লতিকা? বলবে, কেরাসিন তেলটুকু গায়ে ঢেলে দেশলাই ধরিয়ে দাও। দিয়ে গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দিয়ে এসো।

সংসারে সর্বত্র এই উপরি-পাওনার জন্যেই ছটফটানি। মজুর থেকে হুজুর, কেরানি থেকে কর্ণধার—

গাড়ি থেমে গেল।

বসে-বসেই লাট্টু পাকিয়ে ঘুমুচ্ছিল নিবারণ। হঠাৎ চমকে জেগে উঠল। ও মা, বৃষ্টি পড়ছে যে ঝুপঝুপ করে, গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছে, বিদ্যুতের ঝলস দিচ্ছে থেকে-থেকে। এ কোনখানে দাঁড়াল গাড়ি? কোন জায়গা? দুপাশে একটু দূরে দূরে কালো কালো কদাকার পাহাড়ের পাহারা। আর যখন বিদ্যুৎ নেই তখন কী নিরেট অন্ধকার। গাড়ি আর জায়গা পেলনা দাঁড়াতে? এখানে মার্চেন্ট কোথায়?

ধৈর্য ধরো। ঘাবড়াও কেন? গাড়ি যখন থেমেছে তখন মজা একটা আছেই।

মজা বুঝতে দেরি হল না নিবারণের। গাড়ি পার্টিং হয়ে গেছে। ভ্যাকম-গজ-মিটারের কাঁটা 'জিরো'তে গিয়ে ঠেকেছে। কাপলিং ছিঁড়ে গেছে ওয়াগনের। হয়তো ভেঙে গেছে ড্র-বার।

এখন উপায় ?

জায়গাটার দিকে ঠাহর করে একবার তাকাল নিবারণ। বিশালকায় পাহাড় আর বুনো ঝোপ ঝাড় দেখেই সে আন্দাজ করেছিল— তবু বিদ্যুতের আলোয় মাইল পোস্ট দেখে সে নিঃসন্দেহ হল পরেশনাথের কাছাকাছি। ঠিকঠাক বলতে গেলে পরেশনাথ পেরিয়ে এসে পরের স্টেশন চৌধুরীবাঁধের মাইল দুয়েক দূরে এসে ঠেকেছে।

ধারে-পারে কোথাও জন-প্রাণী নেই। নেই ছিটে-ফোঁটা আলোর কণিকা। আকাশের একটি তারাও জেগে নেই, তাকিয়ে নেই। বিশাল ভয়াল অন্ধকার। অজানার রাজ্য।

একটা সিগারেট ধরিয়ে মনে সাহস আনতে চাইল নিবারণ। দেশলাই জ্বলল অনেক ঘষা-ঘষি করে। ঘড়িতে দেখল রাত প্রায় দুটো। কিন্তু সিগারেট ধরানো গেলনা। সিগারেট ভিজে জ্যাবজেবে হয়ে গিয়েছে।

যদিও শত ছিদ্র দিয়ে জল পড়ছে ব্রেকভ্যানে, গাড়ির চেহারা দেখতে তবু নেমে দাঁড়াল না নিবারণ। তার ভয় করতে লাগল। ভীষণ ভয় করতে লাগল। মনে হল কে যেন তাকে হঠাৎ একটা বিরাট অনুভূতির মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যা বিরাট তাই ভয়ঙ্কর।

খানিক পরে ঢিকোতে-ঢিকোতে ড্রাইভার এসে হাজির।

দু'খণ্ড হয়ে গিয়েছে গাড়ি। ছিঁড়ে গিয়েছে গাঁটছড়া। প্রথম খণ্ডের লাস্ট ওয়াগনের নম্বরটা দেখে এসেছ? ড্রাইভারকে জিগগেস করল নিবারণ।

হ্যাঁ, ড্রাইভার নম্বর দিলে।

তবে আর কি, ঐ লাস্ট নম্বর দিয়ে মেমো লিখে দিই আগের স্টেশনের এ-এস-এমকে। মেট আর জ্যাককে নিয়ে তুমি প্রথম খণ্ডটা নিয়ে বেরিয়ে যাও এঞ্জিন সমেত। এ-এস-এম কণ্ট্রোলকে খবর দেবে। তারপর, ইতিমধ্যে যদি বেঁচে থাকি, আসবে রিলিফ-এঞ্জিন। মুণ্ডু চলে গিয়েছে আগে, পরে টেনে নিয়ে যাবে ধড়টাকে।

আগের আধখানা ট্রেন নিয়ে ড্রাইভার বেরিয়ে গেল। জীবনের সঙ্গে যে একটু ক্ষীণ সংস্পর্শ ছিল তাও গেল নিশ্চিহ্ন হয়ে।

আধখানা ট্রেনের শেষ চাকার শব্দ মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। কোথাও আর সম্পর্কের এতটুকুও বন্ধন রইল না। সে একেবারে একা, নিঃশেষ রূপে নিঃসঙ্গ। তাকে ঘিরে প্রাচীন অরণ্য, মহামহিম পর্বত আর অগম্যরূপ অন্ধকার। এই বিশ্বসংসারে সে শুধু সঙ্গীহীন নয়, সে একেবারে দ্বিতীয়রহিত। পৃথিবীতে পরিত্যক্ত প্রথম প্রাণ।

কিন্তু ভয়ে কুঁকড়িসুকড়ি হয়ে ব্রেক-ভ্যানে বসে থাকলে

চলবেনা। তাকে তার শেষ আশ্রয়টুকু ছেড়ে নেমে পড়তে হবে এই অপরিচিত অন্ধকারে। এই দুর্বোধ উপস্থিতির মুখোমুখি।

কিসের টানে নেমে পড়ল নিবারণ। চারদিকে চোখ বুলিয়ে একবার বুঝে নিতে চাইল চেহারাটা— চোখ বন্ধ হয়ে গেল। চারদিকে শুধু বিশালস্তূপ পাহাড় আর দুর্ভেদ্য জঙ্গল। আর সমস্ত চরাচর আচ্ছন্ন করে দুর্জ্ঞেয় অন্ধকার। তার সংকীর্ণ সংসার থেকে ছিন্ন করে কে নিয়ে এল তাকে এই বিশাল অনুভূতির মাঝখানে! তার ছোট ঘর ছোট উঠোন থেকে অন্তহীন এই অঙ্গনের মুক্তিতে। তার প্রাণধারণের ছোট ছোট চেতনার বিন্দু থেকে মহিমময় মৃত্যুর মুখোমুখি।

খল-খল খল-খল শব্দে কে যেন হঠাৎ উচ্চরোলে হেসে উঠল। ভয়ে চমকে উঠে চোখ মেলল নিবারণ। না, ভূত-প্রেত নয়, কাছেই কোথায় একটা পাহাড়ী ঝর্ণা বৃষ্টির জল পেয়ে উল্লাস করে উঠেছে। কে জানে, তাকে দেখে যেন খর-খল-হাস্যে বিদ্রূপ করে উঠেছে। যে মহা স্তব্ধতা পুঞ্জিত হয়ে আছে পাহাড়ে-অরণ্যে তা যেন অমনি এক উপহাসেরই উচ্চস্বর। সে যে এক ক্ষীণপ্রাণ হীনমতি প্রগলভ মানুষ তারই প্রতি উপহাস। তার যে একটা ছোট সংসার আছে, ভীরু আশা আর হীন হতাশা দিয়ে তৈরি— তারই

প্রতি উদ্ধত ব্যঙ্গ। তার ক্ষুদ্র লোভ ক্ষুদ্র সঞ্চয় ক্ষুদ্র ভবিষ্যৎ চেতনার উপরে কঠিন ভর্ৎসনা।

মাইল পোস্ট লক্ষ্য করে শ্লিপারের উপর দিয়ে পিছন দিকে এগিয়ে যেতে লাগল নিবারণ। কোয়ার্টার মাইল দূরে রেল-লাইনের উপর ডিটোনেটর প্লেস করতে হবে। গায়ে বর্ষাতি হাতে হাত-বাতি নিয়ে চলেছে সে পাহাড়ের বেষ্টনীর মধ্যে। যেন প্রথম আবিষ্কারের পৃথিবীতে প্রথম মানুষ তার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। ছিপ-ছিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে, পা মেপে মেপে এগিয়ে চলেছে নিবারণ। কোয়ার্টার মাইলের মাথায় ডিটোনেটর ফিক্স করে দিল। আরো যেতে হবে কোয়ার্টার মাইল। সেখানে গিয়ে দশ গজ দূরে-দূরে আরো তিনটে প্লেস করতে হবে। একেই বলে ফগ সিগন্যাল। আকস্মিক যদি কোনো ট্রেন এসে পড়ে আপ-লাইনে তবে আধ মাইল দূরেই পর-পর তিনটে ফটকা ফাটবে। তখনই কষে দেবে ব্রেক। আর যখন আরো খানিক এগিয়ে এসে একটা ফটকা ফাটবে তখনই করে দেবে ডেড স্টপ। দাঁড়িয়ে যাবে পিছুকার ট্রেন, বেঁচে যাবে দুটো গাড়িই।

কিন্তু পা চলেনা আর নিবারণের। মনে হয় আরো কোয়ার্টার মাইল এগিয়ে যাবার আগেই যেন দুর্দান্ত বেগে ছুটে আসবে পিছনের ট্রেন। মুহূর্তে সর্বনাশ ঘটে যাবে।

বিদীর্ণ হয়ে পড়বে অসহায় মানুষের করুণ আর্তধ্বনি— তাইতো জীবনধ্বনি।

সেই আর্তধ্বনি যেন স্তব্ধীভূত হয়ে আছে এই অন্ধকারে। পাষাণ হয়ে আছে এই পাহাড়ের রুক্ষতায়।

না, দূরের ডিটোনেটরও লাগিয়ে আসতে পেরেছে। বেঁচে যাবে গাড়ি— যদি না ড্রাইভার মাতাল হয়, যদি সে না ঘুমিয়ে পড়ে।

কিন্তু নিবারণ বাঁচবে না। কতক্ষণ পরেই জঙ্গল থেকে বাঘ বেরুবে, কিংবা শুনেছি ভালুক আছে এ অঞ্চলে। বাঘ-ভালুক না হোক, সাপ উঠবে গা বেয়ে। যা হবে তা হবে, এখন ফিরে যেতে হবে গাড়ির কাছাকাছি। হাত-বাতি লাল করে তাই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ব্রেক-ভ্যানের পিছনে। তু পাশে তুই সাইড-ল্যাম্পের লাল বাতি, টেইল-ল্যাম্পের লাল বাতি, তার উপরে আবার এই হ্যাণ্ড-সিগন্যালের লাল বাতি। যদি, ডিটোনেটর অগ্রাহ্য করলেও নজরে পড়ে এই সর্বনাশের নিশানা।

কে জানে পড়বে কি না। কিন্তু তার আগেই নিবারণ মরে যাবে। শুধু আতঙ্কে মরে যাবে। বাঘ-ভালুক চোর-ডাকাত ভূত-প্রেতের ভয় নয়। আরেকরকম ভয়। সংজ্ঞা-হীন সীমাহীন শরীরহীন ভয়। একটা বিরাট চেতনা, বিশাল উপস্থিতির ভয়। এই তুশ্ছেন্ত অন্ধকারে সে যে

একেবারে একা, তার ঘর নেই, বাড়ি নেই, তার স্থির কোনো আশ্রয় নেই, দৃঢ় কোন পরিচয় নেই, তার ভয়। এই মুহূর্তে ক্ষুদ্র ঘুষ ক্ষুদ্র প্রমোশন ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির কথা যে মনে আসছে না— শুধু মৃত্যুর কথা মনে আসছে— তার ভয়।

মনে হচ্ছে সেই ভয় যেন মূর্তি গ্রহণ করছে। সমস্ত পাহাড়-অরণ্য স্তব্ধতা-অন্ধকার মিলে এক বিরাট পুরুষের আকার নিচ্ছে তার চোখের সামনে। যেন প্রচণ্ড তাণ্ডব মূর্তি অথচ আদিমধ্যান্তশূন্য অশরীরী—

এই বোধ হয় মৃত্যুর আবির্ভাব।

কিন্তু পেছনের সেই উদ্দাম ঊর্ধ্বগতি ট্রেন কই?

না, তার বদলে আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। পূর্ণিমার চাঁদ লাল হয়ে অস্ত যাচ্ছে পশ্চিমে। পূবে লাল হয়ে জাগছে সুগোল সূর্য। নিবারণের মনে হচ্ছে যেন সেই বিরাট পুরুষ দুই হাতে সোনার খঞ্জনি বাজাচ্ছেন। জন্ম-মৃত্যুর খঞ্জনি।

গাইছেন নব জীবনের কীর্তন।

সমস্ত মৃত্যুর পর এই নবজীবনের সংকেত সমস্ত ক্ষুদ্র অস্তিত্বের পর এই বিরাট এক সত্তার অনুভব— এইটিই আজকের উপরি পাওনা।

আজকের নয়, অনন্তকালের।

নৈবেদ্য

খোকা বি-এল-এ ব্লে, সি-এল-এ ক্লে পড়ছে।

'ডি-এল-এ কি হয়, আম্মা ?'

রসিদা কাছে বসে হাত-কলে সেলাই করছে ঘাড় গুঁজে। নতুন জোগাড় হয়েছে মেশিনটা। তাই কিছুদিন দর্জির ঘরে না পাঠিয়ে নিজেই মক্স করছে ঘরে বসে। বললে, 'কিছু হয় না।'

'ই-এল-এ ?'

'ওও কিছু না।'

'এফ-এল-এ ?'

'ফ্লে।'

'জি-এল-এ ?'

'গ্লে।'

এমনি পড়ে যাচ্ছে খোকা সাহেব। কোনোটা হয়, কোনোটা হয় না।

'এম-এল-এ ?'

পাশেই চেয়ারে বসে রহমান চা খাচ্ছে—তার প্রাভাতিক তৃতীয় কাপ। গোড়াতেই নালিশ করে রেখেছে চিনি বেশি হয়েছে, যার মানে হচ্ছে এই আরেক কাপ শিগ্‌গিরই দরকার হবে। পড়ছে দু দিনের বাসি খবরের কাগজ—স্বাধীনতার আর কত দূর! হঠাৎ ছেলের প্রশ্নে সে সচকিত হয়ে উঠল। বললে, 'এম-এল-এ ? ও তোমার নানা, তোমার আম্মার আব্বাজান, আমার মহামহিমার্ণব শ্বশুর মহাশয়।'

প্রথমটা রসিদা হাসল, কিন্তু কথার সুরের শ্লেষটুকুতে শেষ দিকে গম্ভীর হয়ে গেল।

বললে, 'কিছু হয় না।'

কিছুই হয়নি বটে শ্বশুর! এমন ফালাও-ঢালাওএর বাজারে হাঁ-র দলে না গিয়ে না-র দলে গিয়ে বসেছে। বসেছে উলটো দিকে, বিরুদ্ধ আসনে। হাতের তাসে তুরুপের তাই জোর নেই, ফেরাইরাও তাই সব ফেরারী। রং থাকতে দশের পিঠে তুরুপ করতে না পারলে তাস খেলায় জিতবে কি করে ?

রসিদা বলে, নিজের পায়ের জোরেই দাঁড়াতে পারা উচিত। কোমরের জোর কোনো কাজের কথা নয়।

আগে গবা ছিল, এখন হয়েছে গোবর্ধন। আগে উকিল

ছিল এখন হয়েছে কনট্রোলার সাহেব। কিন্তু যা চালভাজা তাই মুড়ি নয়।

আসলে চাকরিটুকু পেয়েছিল রহমান এই শ্বশুরের মাতব্বরিতে। সেই ভোটাভুটির সময়। তার শ্বশুর কোন খাতায় নাম লেখায় সেই গড়িমসির সময়। জামাইকে চাকরি দিয়ে ভেবেছিল শ্বশুরকে বশ করতে পারবে। কিন্তু শ্বশুর বড় রোকাচোকা মানুষ, নিজের গোঁ ছাড়ল না; ভেড়ার গোয়াল ছেড়ে ঢুকলো গিয়ে গুঁতুনে গরুর গোয়ালে। লাভ হল কি? নামে গোয়ালা, কাঁজি ভক্ষণ।

রহমান খুব তাই খুশমেজাজ নয় শ্বশুরের উপর। সংসারে কে না আরো উন্নতি করতে চায়! কে না আরো উঠতে চায় উপরে! পর্বতশৃঙ্গের কি শেষ আছে?

বড় মেয়ে তসলিমা ক্লাশ এইটে পড়ে। খাতা পেন্সিল নিয়ে হাজির। বললে, 'এ কথাটা য়্যামপ্লিফাই করে দিতে হবে।'

'কোন কথাটা?'

'মেক হে হোয়াইল দি সান শাইনস্।'

'তোমার আম্মার কাছে যাও। আমার সময় নেই।'

রসিদা ঝংকার দিয়ে উঠল: 'কেন, এখন তো আর পারমিট ইশু করছ না বা ডেপুটেশনও শুনছ না। সময়ের অভাবটা কোথায়? দাও না মেয়েটাকে একটু বুঝিয়ে।'

'কলেজে-পড়া বিদুষী মেয়ে যে শাদি করেছিলাম, তা তবে আমার কোন কাজে লাগছে? ঐ বি-এল-এ এম-এল-এ পর্যন্ত?'

এই নিয়ে সুরু হল টিকাটিপ্পনি। টিকাটিপ্পনি থেকে অন্তরটিপুনি। অন্তরটিপুনি থেকে টিটকিরি। টিটকিরি থেকে—

শেষ পর্যন্ত রসিদা বললে মেয়েকে লক্ষ্য করে 'ও কথার অর্থ হচ্ছে বেলা থাকতে থাকতে কাজ বাজিয়ে নাও। টেম্পোরারি চাকরি থাকতে থাকতে আখেরের বন্দোবস্ত করে রাখো। লোহা গরম থাকতে থাকতে হাতুড়ির ঘা মারো। সেই বলে না, দিন থাকতে বাঁধে আল, ভাত খাবে সোনার থাল। তেমনি ধারা আর কি। একথা আর কে না জানে!'

এ কথাটাই তারা অন্য সময় অন্য ভাবে আলোচনা করেছে।

'যুদ্ধ শেষ হলেই কনট্রোল উঠে যাবে। আর কনট্রোল উঠলেই তোমরা গেলে।'

'আমরা গেলাম বলো। তুমি-আমি এক নৌকোর সোয়ারী।' রহমান সান্ত্বনার সুরে বলেছে: 'কিন্তু ভয় নেই, কনট্রোল উঠবে না।'

'উঠবে না?'

'না, যুদ্ধ থেমে গেলেও থামবে না তার বিশৃঙ্খলা।

খিদের পরেও একরকম তুষ্টু খিদে থাকে। সবাইর চোখে সেই তুষ্টু খিদে। পাপের মূল রোগের মূল অনেকদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে।'

'কিন্তু দেশ যখন স্বাধীন হবে?'

'আগে স্বাধীন তো হোক।'

'হবে তো একদিন। আর, যুদ্ধ থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে যাবে দেখো। তখন? তখন নিশ্চয়ই ছাড়িয়ে দেবে তোমাদের।' রসিদার চোখে উদ্বেগ ফুটে উঠেছে।

কিন্তু রহমানের চোখে নিশ্চিন্ত হাসি। বলেছে, 'স্বাধীন হয়ে যে দেশ চাকরি ছাড়িয়ে নেয়, সে-দেশের আবার স্বাধীনতা কোথায়? স্বাধীন দেশে বেকার হয়ে গিয়েই কি আমরা সেই স্বাধীনতার স্বাদ নেব? অসম্ভব। টেম্পোরারি বলেই আরো বেশি করে মায়া হবে— আহা, টেম্পোরারি, যাবে কোথায়, খাবে কি। তাই বিন্দুমাত্র ভয় কোরো না, চাকরিতে ঠিক বহাল থাকব।'

'কিন্তু মাইনে নিশ্চয়ই কমিয়ে দেবে দেখো।'

'বরং বেড়ে যাবে। সাহেবরা চলে যাবে, আর তাদের চেয়ারে বসে বলব সাহেবদের মতন বাঘা-বাঘা মাইনে দাও। ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা। বাঘকে মাংস খাইয়ে বলতে পারে না ধান খা গে যা। আর যদি সত্যি

নেহাৎ শাকই দেয়, ভয় নেই, শাক দিয়ে নিভ্যিকার মাছের টুকরোটাকে ঠিক ঢাকতে পারব।'

তবুও কথাটা 'টেম্পোরারি'। কেমন যেন একটা কাঙালী বিদায়ের গন্ধ আছে। প্রজাই স্বত্ব নয়, অনুমতি-সূত্রে বসতকার দখল। বারোমেসে ভাবনা নিয়ে নদীকূলে বাস করবার মত। সুতরাং যা পারো এই বেলা হাট থাকতে-থাকতে বাজার করে নাও। যৌবন থাকতে-থাকতে নাগরালি।

তা বাজার মন্দা যাচ্ছে না রহমানের। মোটা মাইনে, যত-ইচ্ছে টি-এ, যা-খুশি আফিসের আসবাব, যতবার-দরকার ট্রাক-জিপ— এসব তো ইঁদুর-টিকটিকি। হাতী আছে দুয়ারে বাঁধা। দেখতেও প্রায় সব হাতীর মত। সব ডাকসাইটে ডিলার। কেউ চিনি, কেউ কয়লা, কেউ কেরাসিন, কেউ কাপড়, কেউ ঢেউ-টিন। উনকোটি চৌষট্টি।

স্ত্রীর সঙ্গে বনে না রহমানের।

বলে, 'ঘরে-দোরে এত রঙ-বেরঙের পর্দা ঝোলানোটা ঠিক হচ্ছে না। লোকে কি বলে?'

'কি বলবে?' রসিদা ঝাঁকরে ওঠে: 'বেসরা-বেপরদা থাকব নাকি?'

'তা কে বলছে? তবে অত দামী কাপড়ের না করে ছেঁড়া কাপড়চোপড়ের করলে ভাল হত না?'

'তোমার ইচ্ছে একেবারে সেই হেঁজিপেঁজি হয়েই থাকি।'

তা নয়, তবে লোকে যাতে চোখ বাঁকা করে এমন সাজ-গোজের দরকার কি। একটু নির্লিপ্ত একটু নির্লোভ দেখানোটাই কাজের কথা। উড়ু উড়ু উসকোখুসকো ভাব। বাড়ির সামনে বাগান না করে আগাছা গজিয়ে রাখা। যেমন চুলে ভালো ছাঁট না দিয়ে কাগাবগা করে রাখলে ছেলেকে লোকে সচ্চরিত্র বলে। অমন নেটের মশারিটা খাটের সঙ্গে আটকে না রেখে দিনের বেলা খুলে রাখলেই তো হয়, ছেঁড়া-টাকে দিয়েই তো বদলি খাটানো যায়। সব সময়ে জমকালো শাড়ি পরে থাকলে লোকে, মানে স্ত্রীলোকে, কী ভাবে? চোখ টাটায় না? গায়ে-গলায় যে নতুন গয়না হয়েছে তা পাড়াবেড়ানীদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর কী দরকার! আর, ওরা এলে অত চা-মিষ্টি খেতে দেবার ঠেকা কি! বললেই হয়, চিনির বড় টানাটানি!

থমথমে মুখ করে রসিদা বলে, 'এত বড় চাকরি করেও গরিবের হাল ধরে থাকব এ কী রকম রেওয়াজ-রীতি! শাড়ি-গয়না সব আমার যুদ্ধের আগে কেনা না? এ কে না জানে?'

বড় চাকরির ঝাঁজ রহমানও সর্বাঙ্গে অনুভব করে। কিন্তু নিজের মুখের ঝাল নিজের মুখের মধ্যেই রেখে দেয়।

কত বড় চাকরি! সকালে উঠেই সকলের প্রথম চিন্তা, আল্লা-হরি নয়, অন্নবস্ত্র। অতএব সাত-সকালে প্রথমেই

তাকে সবাই স্মরণ করে। এক রামে রক্ষা নেই তায় আবার বিভীষণ। অন্নের উপরে আবার বস্ত্র। একে মনসা তায় আবার ধুনোর গন্ধ। তাই সে যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটে তার পিছু নেয় জনতা— ভাত চাই, কাপড় চাই, কেরাসিন চাই, ছেলের পথ্য খাবার জন্যে একটু চিনি চাই হুজুর। এস-ডি-ও খানের পিছেও লোক ছোটে, কিন্তু তারা সব বাজে উমেদার, যত সব ভূষিমালের কারবারী। ধমক দিলেই সরে পড়ে। কিন্তু তার পিছনের লোককে হাজার দাবড়ি দিয়েও হটানো যায় না। নিজে ছুটতে আরম্ভ করলে তারাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে আরম্ভ করে। তাদের যে অন্নবস্ত্রের খাঁকতি।

ক্লাবে যেটা অগ্রগণ্য চেয়ার, মানে যেটা সদর-রাস্তার মুখোমুখি, সেটা আগে এস-ডি-ওর জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। রহমান এসে সেই চেয়ার বেদখল করে নিয়েছে। খানের মাইনে ধাপে-ধাপে, আর রহমানের মাইনে এক লাফে। রহমানকে ধরতে খানের এখনও আট-দশ সিঁড়ি বাকি। সুতরাং ঐ চেয়ারের সেই সঠিক হকদার। এই চেয়ার নিয়েই দুজনের ঝগড়া। ঝগড়া করে লাভ কি, যার যেমন চাকরি তার তেমন চেয়ার। খান যদি আজ রহমানের চাকরি করে তা হলেও তার মাইনে ধাপে-ধাপে তেমনি খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়েই চলবে, লাফ দিতে পারবে না। সুতরাং

ঈর্ষা করে লাভ কি, চাকরিরই ওজন-ভোজন আলাদা। খানের যদি টিকারা, রহমানের তবে কাড়ানাকড়া।

কত বড় একজন কেষ্টবিষ্টু সে। সেদিন ছাত্রীরা এসেছিল তার কাছে দল বেঁধে। উপরের ক্লাসের ছাত্রীরা। ওরি মধ্যে ছিমছাম হয়ে। তাদের শাড়ির দরকার, সায়া-সেমিজের জন্যে লংক্লথের দরকার। অনেক্ষণ ধরে শুনেছিল সে তাদের অভাব-অভিযোগের কথা। খুব সহানুভূতির সঙ্গে, স্নেহসিক্ত মুখে। যখনই কেউ অভাব-অভিযোগ করতে আসবে, ধৈর্য ধরে মুখমণ্ডল স্নিগ্ধ করে শুনে যাবে আগাগোড়া। আহা-উহু করবে। প্রতিবাদ করবে না, তর্ক করবে না, শান্তভাবে সায় দিয়ে যাবে। টোকচা কাগজে একটু বা নোট নেবে হিজিবিজি। সত্যিই তো, বড্ড কষ্ট হচ্ছে আপনাদের, যথাসাধ্য ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। দেখবে গুমোট কেটে যাবে, রাগ-বিরাগ জল হয়ে যাবে, তূণ থেকে খসে পড়বে সব শর-তীর।

যে যখন আসবে, সর্বক্ষণ তাদের অভাব-অভিযোগ শোনাই তো জনসেবা— গণতন্ত্র। তুমি-আমি কোন ছার, আবো উপরতলাতেও এই কাণ্ড। লোক ফিরিয়ে দাও দেখা হবে না বলে, অমনি কুরুক্ষেত্র।

কুরুক্ষেত্রের চেয়ে শস্যক্ষেত্রই সুবিধে।

আসছে, লোক আসছেই। কত কাকুতি-মিনতি, কত

খোসামোদ। লোক বুঝে কলম ধরবে, দরখাস্তের মার্জিনে কারিকুরি করবে। ঢেউ-টিন দরকার, এসেছে লক্ষ্মণ সা। দিয়ে দাও। তুমি? আমি কাদের পেশকার। একখানা দলিজ ঘর বানাব। কেটে পড়। আমরা মাদ্রাসা থেকে এসেছি। কি চাই? সবেবরাতের চিনি। দিয়ে দাও দু বস্তা। আপনারা? লক্ষ্মীপূজোর চিনি? যান, ডিলারের ঘরে দিয়ে দিয়েছি ইয়ারমার্ক করে। আর তোমার? পেটের ব্যারাম, রাত্রে খাওয়া বারণ। শুধু একটু চিনির সরবৎ। সরবৎ খাবেন তো পর্বতে চলে যান, এখানে হবে না। দুজন অফিসারবাবু এসেছেন। এ কি, আপনারা? উপর-ওয়ালা আসছেন ইনস্পেকশনে। তুমুল করে একটা পার্টি দিতে হবে। রিসেপশান যত জমকালো হবে ইনস্পেকশনও ততই ফলবন্ত হবে। যদি বাঁচে কিছু, দিয়ে দেব নগদবিদায়। বুঝতেই তো পাচ্ছেন।

বুঝতে আর পাচ্ছি না?

'ভগবতী বাবু এসেছেন।' আর্দালি বললে পর্দার বাইরে থেকে।

'কে ভগবতীবাবু? পাল না পোদ্দার?' রহমান বিরক্ত হয়ে উঠল।

পাল হচ্ছে আপিসের কেরানি, পোদ্দার হচ্ছে ডিলার।

'পোদ্দার।'

'দিনের বেলা আসে কেন? যাও, বসতে বল গে।'

শীর্ণ গলায় চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে খোকা কাঁদছে। আজ নয়—দশ দিন ধরে জ্বর। কাঁদছে রোগের যন্ত্রণায় নয়, বার্লি-শটির সঙ্গে সে মিছরি খাবে। কতদিন আগে একবার অসুখের সময় যে মিছরি খেয়েছিল তার স্বাদটা আজ হঠাৎ মনে পড়েছে তার। এ কয়দিন চিনির জন্যে কাঁদছিল, আজ একেবারে মিছরির জন্য বায়না ধরেছে।

'গুড় দিয়ে পানা করে এনেছি, খেয়ে ফেল, খুব ভাল লাগবে খেতে—'

'ওয়াক, থু, গন্ধ— বিচ্ছিরি, খাব না, কিছুতেই খাব না।'

অনেক আখুটি করছে ছেলে, অবুঝ গোঁয়ারের মত। মায়ের দুঃখ বুঝছে না একটুও। আল্লা তো বুঝছেনই না, নিজের পেটের ছেলেও আখড়বাজ।

হাতের ঠেলায় বাটিটা ফেলে দিল খোকা। রাহাতনের কি হল, রোগা হাড্ডিসার ছেলেটাকেই সে শক্ত হাতে মার দিলে। বার্লিই জোটে না, তায় আবার চিনি-মিছরি! থাক, থাক, থাক তুই না খেয়ে।

খোকার বাপ কাইজার আলি নিচের তলার কেরানি, সব শেষের এঁদো ঘরটাতে। একেবারে নামা অবস্থা। চাল-ডাল তেল-নুনই জোগাড় করতে পারে না, তায় আবার

বার্লি-সুজি, চিনি-মিছরি ! তবু ছেলের আখুটি স্ত্রীর অবুঝপনা বুকের মধ্যে বেঁধে এসে শেলের মত। শাদা চোখে, শাদা বাজারে অন্ধকার দেখে। যায় সাপ্লাই আপিসে কোনো আস্কারা করতে পারে কি না। কেরানি কবির মিয়ার সঙ্গে তার চেনাশোনা আছে।

'এক আধ সের চিনি দিতে পার ? ছেলেটার খুব অসুখ।'

দু চারদিন ঘোরাফেরা করতে হবে। ফিকির খুঁজতে হবে শিলিপের। গাঁ থেকে অনেক উমি লোক আসে, যাদের নামে মাঝে-মধ্যে শিলিপ ইশু হয় অথচ যারা বাতিল হয়েছে জেনে 'আল্লা—' বলে সরে পড়ে। ভিড়ের মধ্যে বসে থেকে চলে যায়, মিশে যায় আবার ভিড়ের মধ্যে। সেই রকম দু চারটে ফস্ত শিলিপ ধরতে হবে। কিন্তু আমার বখরাটা আগাম চাই। গরিবের বেলায় ঘুষ, দেবতার বেলায় নৈবেদ্য।

কিন্তু, ভাইসাব, আমার আজ এক্ষুনি দরকার। ছেলেটা বার্লির বাটি ছুঁড়ে দিয়েছে। পথ্য না খেয়ে খেয়েছে মার, হাতের মার।

সবাই আমরা আল্লার হাতের মার খাচ্ছি। বাটি-ঘটি ছুঁড়ে মারলেই কি এই যুদ্ধ জিততে পারবে, ভাইসাব ?

গুটি-গুটি চলল এবার খোদ হাকিমের কাছে।

'যান, যান, আর কাপড় হবে না।' বাইরে থেকে

শুনতে পেল কাইজার, সাহেব কাকে হাঁকড়াচ্ছেন। 'সেদিন একজন স্ত্রীর বলে শাড়ি নিয়ে গেল, শেষকালে কিনা বেচলে মশাই বাড়ির ঝিকে। দুটাকা মুনফা রেখে!'

'কিন্তু শ্রাদ্ধশান্তিতে কাপড় না হলে চলবে কেন?'

'ঐ দুখানা দিয়েছি তাই যথেষ্ট। আরো লাগে, ওরি থেকে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে নিন। বেঁচে থাকতে লোকে পরতে পারে না আপনি আছেন মরার পরে! ঐ কাপড় পাবে তো পুরুত। সেই পুরুতের নাম কি? ওর বরাদ্দ থেকে কেটে নিতে হবে দুখানা।'

ভদ্রলোক বেরিয়ে গেল।

ঢুকল কাইজার। মাছচোরের মত।

'কি চাই?'

'একটু চিনি। এই এক-আধ সের।'

'কেন, ফিরনি-পায়েস খাবার সাধ হয়েছে?'

'না। ছেলেটা বিনা মিঠায় পথ্য খাচ্ছে না—'

'সেটা এমন একটা ব্যাপার যার জন্যে আমাকে য়্যাপ্রোচ করতে হবে?' রহমান স্তম্ভিত হবার ভান করলে। 'কার দুধে জল, কার শাকে বালি, কার ভাতে কাঁকর এইসব এখন তদন্ত করে বেড়াতে হবে আমাকে! আর আমার কাজ নেই? লোক ওষুধ পাচ্ছে না, আপনি আছেন পথ্যের বাবুগিরিতে?'

চলে যাচ্ছিল কাইজার, রহমান ডাকলে। কথাগুলো একটু কড়া হয়ে পড়েছে বোধ হয়। বললে, 'কিছু মনে করবেন না। আমাদেরও চিনি নেই কিনা, তাই মুখের কথাটা আর মিষ্টি থাকছে না।'

মাথায় বাক্স করে হাটে-ঘাটে মিঠাই ফিরি করে বেড়ায় আছমৎ। হিঁদুর মিঠাই আর চলছে না বন্দরে। তাই আছমতের বিক্রিব্যবসা খুব জমজমাট। আনতে-না-আনতেই ছোবলা-ছুবলি।

তাকে ধরল কাইজার। বললে, 'কিছু খুচরো চিনি দিতে পার, মিয়া?'

'দেখব চেষ্টা করে। দু'দিন হয়ত দেরি হবে। কিন্তু খেয়াল করবেন, সের পড়বে দু'টাকা করে।'

'দেব তাই। ছেলেটা মরবার আগে মুখে একটু মিষ্টি পেয়ে যাক। কারু দিকে না তাকিয়ে আমরা পুরুষে-জননায় একটু মুখে দি লুকিয়ে লুকিয়ে। এ কয় দিন ধরে কেউ কাউকে একটাও মিষ্টি কথা বলছি না। মিষ্টি কথাও কি সংসার থেকে বিদায় নিল?'

আছমৎ গেল গঙ্গা ময়রার দোকানে। গঙ্গা ময়রাই আছমতের বেনামদার। গঙ্গা ময়রার দোকান নেহাৎ টিমটিমে। গামলা-পরাত সব সময়েই খালি। বলে, চিনি-ময়দা পাই না। লুকিয়ে-লুকিয়ে বাড়ির মধ্যে বসে যা খাবার

বানায় তা দিয়ে দফায়-দফায় আছমতের বাক্স সাজিয়ে দেয়। বাজারে-বন্দরে ব্যবসা চালায়।

আছমৎ বললে, 'এক সের চিনি চাই ব্ল্যাকে।'

'দেড় টাকা করে সের বলেছিস তো ?'

বলেছি। আছমতের আট আনা মার্জিন। 'ব্ল্যাক' আর 'মার্জিন' কথা ছুটো শিখে নিয়েছে আছমৎ।

গঙ্গা ময়রা গেল ভগবতী পোদ্দারের কাছে। খিড়কির দরজা দিয়ে।

ভগবতীর ঘরে চিনির বস্তা মজুত আছে, ভিতরের ঘরে, খড়ের গাদার নিচে। ভারিক্কি ওজনের পারমিট জোগাড় করে সে। কয়েক বস্তার মুখ খুলে বিক্রি হয়, কয়েক বস্তা বা তলায় ফুটো করে।

ফুটোর চিনি নিয়ে এল গঙ্গা ময়রা। গঙ্গা ময়রা চালান দিলে আছমৎকে।

'ছেলেটা তেতো মুখেই মারা গেল ভাই। চিনি দিয়ে আর কি হবে ? দাফনের জন্যে একখানা নতুন কাপড় খুঁজতে এসেছি।' বললে কাইজার।

'কাপড়ের অন্য লাইন। হাটে ঐ কাটাকাপড়ের দোকানে যান। ওখান থেকে মিয়াজান খলিফা। মিয়াজান খলিফা থেকে কলিম বেপারী।'

চিনি নিল না বলে রাগ করে না আছমৎ। বলে, ন' সিকায় চালান করে দিতে পারব।

অনেকগুলো বাঁকা চোখ একত্র হয়ে রহমানের দিকে একটা সোজা স্পষ্ট দৃষ্টি ধারালো হয়ে উঠল। টুকরো-টুকরো আগুনের কণা থেকে একটা স্থির অগ্নিকুণ্ড।

কিন্তু ম্যাও ধরে কে?

বেশিদূর জট পাকাতে দেওয়া হয় না। তদবির করে-করে রহমান বদলির বন্দোবস্ত করলে।

তারই প্রাক্কালে আজ সমারোহ পার্টি হচ্ছে। ডিলারেরা মোটা হাতে চাঁদা দিয়েছে। যাদের দিতে কষ্ট হয়েছে, মুখে হাসি টেনে তারাও। দেশময় দুর্ভিক্ষ হোক, পার্টি-ডিনার বাদ পড়বে কেন? তলার লোক মরছে বলে উপরের লোক ফূর্তি করবে না?

মিষ্টির ছড়াছড়ি। আবার-খাব, রাঘবশাহী, মনোহরা, রসকদম্ব। ফেলাছড়া করে খাচ্ছে সবাই। এক গামলা পাঠানো হয়েছে রহমানের বাড়ির মধ্যে, বাকি যা থাকবে নেবে অর্গানাইজাররা। হাতে-দৈ পাতে-দৈ তবু কই-কইর অবস্থা। রাস্তার বাইরে বেড়া ধরে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে দেখে। চমকিত আর্ত চোখে দেখে এই অধর্মের খাওয়া।

দেখা গেল পুলিশও এসেছে পার্টিতে। নিমন্ত্রিত হয়ে নাকি ?

না, রহমানের সঙ্গে কি দরকার। রহমান গল্প করতে করতে বেরিয়ে গেল একসঙ্গে। মুখ মুছতে মুছতে।

কানাঘুষা চলল প্রথমে। শেষকালে রাষ্ট্র হয়ে গেল গ্রেপ্তার হয়েছে রহমান। কেউ বলে হয় নি এখনো, হবে এবার।

পুলিশ অনেক দিন ধরেই নাকি ঘোরাঘুরি করছে। জুৎসই সাক্ষীপ্রমাণ পাচ্ছিল না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এত দিনে যা হাতে এসে জমেছে তাই যথেষ্ট, তাই সাংঘাতিক।

পাপের ধন এবার প্রায়শ্চিত্তে যাবে— সবাই বলাবলি করল। বাঘের ঘরে ঘোগ বাসা নিয়েছে এবার। চোরের ধন বাটপাড়ে খাবে। হীরে দিয়ে হীরে কাটবে এবার।

ইনি খান ভাঁড়ে, উনি খান ঘাটে। বললে আবার কেউ কেউ। নকড়ির ভাই ছকড়ি।

তাই বলা যায় না। কেউ কেউ মুখচোখ গম্ভীর করলে দস্তুরমত।

কিন্তু না, পুলিশের হাতে আর এবার ছাড়ানছোড়ান নেই। শিন্নিও খাবে, ভরাও ডোবাবে। বঁড়শিতে এমন রাঘববোয়াল গেঁথে ছেড়ে দেবে না। বনমালী আবার বোনা হয়ে যাবে। ধন থাকলেই বনমালী, ধন না থাকলেই বোনা।

শিস দিতে দিতে ছড়ি ঘুরোতে-ঘুরোতে রহমান বাড়ি ফিরল।

কি ব্যাপার ?

প্রসিকিউশান তুলে নিয়েছে সরকার থেকে।

হঠাৎ ? রসিদা আহ্লাদে ঝলমল করে উঠল।

'শোনো, ঐ খোকা পড়ছে—' বললে রহমান।

'কে-এল-এ কি হয় আম্মা ?'

'কিছু হয় না।'

'কিছু হয় না ! এল-এল-এ ?'

'ও-ও কিছু না।'

'কিছু হয় না !' খোকা আবার মুখভঙ্গি করলে : 'এম-এল এ ?'

'হয়, ভীষণ হয়।' ঝমকে উঠল রহমান : 'তোমার নানা হয়। আমার মান্যবর শ্বশুরমহাশয় হন। তিনিই আজ মেঝে ডিঙিয়েছেন।'

তার মানে ?

ইংরিজিতে বলে, ক্রসড দি ফ্লোর, বাঙলাতে বলে, মেঝে ডিঙানো। মানে, না-র দল ছেড়ে চলে গেছেন তিনি হাঁ-র দলে। বিপক্ষ থেকে স্বপক্ষে।

তবে ? রসিদা তার জর্জেটের আঁচলে ঘুরনা দিয়ে উঠল। 'কেন, এখন কেন ? আব্বাজান ছিল বলেই না—'

পুলিশ খালি হাতে ফিরবে না। রুই-কাৎলা না হোক, অন্তত একটা দাঁড়কে-পুঁটি ধরা চাই।

ধরল সেই মাথামুটে আছমৎকে। সে বাজারে-বন্দরে ন' সিকায় চিনি বেচেছে।

নানা-চাচা খালু-মামু আছে কেউ?

কেউ না।

আছমতের তিন মাস জেল হয়ে গেল।